উৎসর্গ।

পরমভক্তিভাজন, অগ্রজ-প্রতিম, অধ্যাপক,

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

ধীমন্!

মন্দাকিনী-পুষ্কর-দাম-পুষ্পৈঃ

পুষ্পৈস্তথা নন্দনজৈরনর্ঘৈঃ।

যৎ পূজ্যতে শঙ্করপাদপদ্মং

ন দীয়তে তত্র কিমু ত্রিপত্রম্?

স্নেহার্থি—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

মুখবন্ধ

কালিদাস ও ভবভূতি ভারতের অমর কবি। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কালিদাস ও ভবভূতিকে ভাল করিয়া চেনা আবশ্যক। তাঁহাদের অনুপম কাব্যাবলীর যথাযথ আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু এ কার্য্য বড়ই কঠিন। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য বলিলেও হয়।

কালেজক্লবে পড়িবার জন্য এই প্রবন্ধ প্রথম বিরচিত হয়। মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা তখন ছিল না। কেন না কালিদাস-ভবভূতির কবিত্বের আলোচনা, বা পরস্পরের তুলনা যে ভাবে করা উচিত, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা হইয়া উঠে নাই, আর আমার ক্ষমতাতেও কুলায় না। পরে আমার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া ইহা মুদ্রিত করিতে প্রতিশ্রুত হই। সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ., ও শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম.এ., এই দুই জন

সুপণ্ডিত, প্রবন্ধের আদ্যন্ত কয়েকবার পাঠ করেন, অনেক স্থল শোধন করিয়া দেন। উক্তকালেজের বি. এ. ক্লাশের ছাত্র, আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভবভূতি সম্বন্ধে কয়েকটী ঐতিহাসিক তথ্য আমাকে দেখাইয়াদেন। এই প্রবন্ধ যাহাতে প্রকাশিত হয়, সে পক্ষে ইঁহারা সকলেই বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু যাঁহার মানসোদ্যানের কুসুম-চয়ন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি, যাঁহার কাব্যা-লোচনা-নৈপুণ্যে আমার ন্যায় নীরস পাষাণেরও চিত্তে কাব্যপ্রিয়তা জন্মিয়াছে, যাঁহার উপদেশ ব্যতীত 'কালিদাস ও ভবভূতি' কদাচ লিখিতে পারিতাম না, যাঁহার ঋণ আমার জীবনে অপরি-শোধ্য, বোধ হয় প্রবন্ধের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়াই, তিনি, ইহাতে তাঁহার নাম সংযোগ করিতে দিলেন না। আমি উদ্দেশে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই প্রবন্ধটীকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ঐতিহাসিক ভাগ ও সমালোচনা ভাগ। প্রথম হইতে 'কুমারিল ও ভবভূতি' (পৃঃ ২২)

পর্য্যন্ত ইতিহাস, আর—'প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাবলীর বিশেষত্ব' (পৃঃ ২২) হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমালোচনা। শেষাংশই আমার প্রতিপাদ্য। প্রতিপাদ্যের প্রসঙ্গে প্রথমাংশ বলিতে হইয়াছে। ঐতিহাসিকের হাতে পড়িলে, প্রথমাংশ যেরূপ সরস হইত, আমার হাতে তাহা হয় নাই। পরন্তু নীরস হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সমালোচনা অংশ দেখিতে চান, তাঁহাদের শেষাংশই পাঠ্য।

কালিদাস ও ভবভূতির সমালোচনা করিতে যাইয়া মাত্র দুই চারিটী স্থলের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে—ঐ প্রকার অনেক করা যাইতে পারে। আশা আছে, সময়ে, বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমার ন্যায় অল্পজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় পদে পদেই ভ্রান্তির সম্ভাবনা। বিজ্ঞ পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

সংস্কৃতকলেজ,
অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। } শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

কালিদাস ও ভবভূতি।*

বিজ্ঞাপন।—আজ আমার পালা—অর্থাৎ কালিদাস ও ভবভূতি সম্বন্ধে আজ আমাকে প্রবন্ধ পড়িতে হইবে। প্রায় বৎসরাধিক পূর্ব্বে যখন কালেজক্লবের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় ক্লবে পড়িবার প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন করিতেছিলেন, তখন আমি নিজেই এই বিষয়টী বাছিয়া লইয়াছিলাম। বিষয়টী যে সোজা নয়—অতিশয় কঠিন, একথা—তখনও বুঝিতাম, আর যত দিন যাইতেছে—কালিদাস ও ভবভূতির—কাব্যাবলী যত অধিকবার নিবিষ্টমনে আলোচনা করিতেছি—তত আরও ভাল করিয়া বুঝিতেছি। এত বোঝা

---

* ৯ই ডিসেম্বর ১৯০৫, সংস্কৃতকালেজে কালেজক্লবে পঠিত। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পড়া সত্ত্বেও এ প্রকার দুরূহ বিষয় লিখিবার ভার লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, কালিদাস ও ভবভূতি সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল ধারণা জন্মিয়াছে,—তাহা একবার ভাল চন্‌চনে আগুণে পরখ করিয়া লওয়া। সেই ধারণায় যতটা বাজে মাল আছে তাহা আগুণে পুড়িয়া যাইবে, যদি কিছু খাটি মালা থাকে, তবে তাহা যত্নে তুলিয়া রাখিব।

কবিতা ও ইতিহাস।—কোনও কবিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বা কোনও কাব্যের সৌন্দর্য্য, নৈপুণ্য পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার ইতিবৃত্ত কতকটা জানা আবশ্যক। কখন কোন দেশ সেই কবি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কখন কোথায় সেই কাব্য প্রথমে লিখিত হয়, তখন তথাকার সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল—ইত্যাদি কতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় না জানিলে কবিত্ব বা কাব্যরস সম্যক্ অনুভূত হয় না। অবশ্য সৎ কবির শ্লোক শ্রবণ করিলেই মনে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে, সত্য,—কিন্তু কেন, কি উপলক্ষে অথবা কখন কে সেই কবিতা গাহিয়াছিলেন—ইহা জানিলে সেই

আনন্দ ষোল আনার স্থলে আঠারো আনা হয়। যেমন—

> "দ্রুং পীযূষমহো দিবোঽপি ভূষণ-
> মসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কঃ?
> মাধুর্য্যং তব বিশ্বতো হি বিদিতং
> সাধ্বী চ মাধ্বীকতা।
> কিন্ত্বেকং স্বপরং স্বরুস্তদমিদং
> ক্রমো ন চেৎ কুপ্যসে
> যঃ কান্তাধরপল্লবে মধুরিমা
> নান্যত্র কুত্রাপি সা॥"

এই কবিতাটি পড়িলেই সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে একটী নির্ম্মল আনন্দ উপস্থিত হয়, কিন্তু যদি সেই অপরিচিত আনন্দ উদিত হইবার পূর্ব্বে জানা যায় যে, যখন সেই 'কাণা পণ্ডিত' রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ত্যাগ করিয়া মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধরমিশ্রের নিকটে অধ্যয়ন করিতে যাইয়া পাঠ সমাপ্তির পর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, তখন উপেক্ষিত বাসুদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে—'বাপু হে! পূর্ব্বেত আমারই কাছে পড়িয়াছ, পরে

পক্ষধরের কাছেও পড়িলে, এখন সরল প্রাণে বল দেখি, কোথায় প্রকৃত অধ্যয়ন সুখ ভোগ করিলে?' এই কথার উত্তরে কাণাভট্ট ঐ উপরি উক্ত শ্লোকটী পড়িয়া পূর্ব্বাধ্যাপক সার্ব্ব-ভৌম মহাশয়কে বক্শীস বা গুরুদক্ষিণা দিয়া-ছিলেন!! এই ইতিবৃত্তটুকু জানিলে ঐ শ্লোকটী পাঠে যে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা আনন্দ হইতেছিল মাত্র,—তাহা জমাট বাঁধে না কি? ষোল আনার স্থলে আনন্দ ভোগ আঠারো আনা হয় না কি? তাই বলিতেছিলাম যে, কোনও কবি বা তাঁহার কাব্যসম্বন্ধে কোনও কথা বলি-বার পূর্ব্বে সেই কবি ও কাব্যের ইতিবৃত্ত জানা আবশ্যক। তাই সর্ব্বাগ্রে অদ্যকার আলোচ্য কবিদের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ কালিদাস—

কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য।—মহাকবি কালিদাস কোন সময়ে ভারতভূমি অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন—এ বিষয়ে, বর্ত্তমানে, প্রধানতঃ তিন প্রকার মত দেখিতে পাই।

১। যে সময়ে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন

শিলালিপি প্রভৃতি আবিষ্কৃত না হইয়াছিল বা হইলেও বিশেষভাবে পড়িয়া উঠা যাইত না, তখনকার কতিপয় পণ্ডিতগণের মতে, কালিদাস, উজ্জয়িনীপতি বিদ্যোৎসাহী বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্—সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। নরপতি বিক্রমাদিত্য খৃঃ পূঃ ৫৭ বৎসরে 'সংবৎ' নামে যে অব্দ প্রচলন করেন, বর্ত্তমানে ঐ সংবতের—১৯৬২ বৎসর চলিতেছে। খৃষ্টীয় ১৯০৫ যদি ১৯৬২ হইতে বাদ দেওয়া যায়, তবেই বিক্রমাদিত্যের কাল খৃঃ পূঃ ৫৭ বৎসর হয়, ইহাই কালিদাসের সময়।

২। আবার—কতিপয় ঐতিহাসিক কালিদাসকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া সন্তুষ্ট হয়েন।

৩। এতদ্ব্যতীত অপরাপর সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতেই মহাকবি কালিদাস খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। ইহা ছাড়া এখন আর একটী নূতন মত দেখিতেছি—সেই মতে কালিদাস ৫ম শতাব্দীর লোক হইয়া পড়েন—কিন্তু ঐমতটী তত বিচার-সহ নহে। যাহা হউক—এই পূর্ব্বোক্ত

তিনটীমতের মধ্যে শেষোক্ত মতটীই আমাদের গ্রাহ্য। অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫৭, খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী এবং খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ—শতাব্দী—ইহার মধ্যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীই যে কালিদাসের আবির্ভাব কাল—তৎ সম্বন্ধে আপাততঃ আপত্তির কারণ নাই। এ বিষয়ে আমার খুব জোর করিয়া বেশী কিছু বলিতে যাওয়া বেয়াদুবী—কেন না এই বিষয়গুলি যাহাদের একচেটে, তাঁহাদের মতই অধিক আদরণীয়।

বরাহ-নবরত্ন।—কালিদাসকে যদি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একথা আরও দৃঢ়তর হয়। কেন না—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাওদাজি, ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ড খাদ্য' নামক গ্রন্থের টীকা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, 'বৃহৎ সংহিতা' নামক গ্রন্থের রচয়িতা, নবরত্নের এক রত্ন, আচার্য্য বরাহ ৫০৭ শকে পরলোক গমন করেন। তাহা হইলে অন্ততঃ ৫০৭ শকে পর্য্যন্ত যে নবরত্ন ছিল, ইহা স্থির। সুতরাং কালিদাসও যে ছিলেন—ইহা ও স্থির।

কনিষ্ক।—নরপতি কনিষ্ক ৭৮-খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন—এবং ঐ করোনেশনের সময় হইতেই এক সাল প্রচলিত করেন, উহাই 'শাক' বা 'শকাব্দা' নামে অভিহিত। সুতরাং শকাব্দায় ৭৮ যোগ করিলেই খৃষ্টীয় শতাব্দী পাওয়া যায়। তাহা হইলেই আচার্য্য বরাহের মৃত্যু ৫০৭ শকে হইয়াছিল বলিলে—৫০৭ + ৭৮ = ৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। বরাহ যখন নবরত্নের অন্যতম, তখন ৫৮৫ খৃষ্টাব্দেও নবরত্নের অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে। কালিদাস নবরত্নের প্রধানরত্ন ছিলেন। নবরত্নের কাল ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইলে কালিদাসকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক সুতরাং বলিতে হইবে।

এখানে আবার কেহ কেহ বলেন যে, বৃহৎ সংহিতায় যে 'বরাহের' উল্লেখ আছে, তিনি নব রত্নের 'বরাহ' নহেন—অন্য 'বরাহ'—ইত্যাদি। 'বরাহ' লইয়াই যাঁহাদের এ প্রকার কলহ, আমি তাঁহাদিগকে দূর হইতে অভিবাদন করি।

যশোধর্ম্মদেব-বিক্রমাদিত্য।—বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ, বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দেখিয়া

স্থির করিয়াছেন যে, 'বিক্রমাদিত্য' একজন কোনও নির্দ্দিষ্ট নরপতির নাম ছিল না। ভারতীয় প্রাচীন রাজগণের অনেকেই 'বিক্রমাদিত্য' আখ্যা গ্রহণ করিতেন। যেমন 'জগৎশেঠ' বলিতে একজনকে বুঝায় না, সেই রূপ 'বিক্রমাদিত্য' আখ্যা বা উপাধি, মাত্র এক জনের ছিল না। অনেকের মতে মালবপতি যশোধর্ম্ম দেবের অন্য নাম 'বিক্রমাদিত্য'। এখন কথা এই যে, যশোধর্ম্মদেবই যে 'বিক্রমাদিত্য' ইহার নিশ্চয় কি? যখন পণ্ডিত ফ্লীট ঐ নামাঙ্কিত শিলা-লিপির পাঠ নির্ণয় করেন, তখন তিনিও ঠিক বলিতে পারেন নাই যে নামটী যশোধর্ম্ম না যশোবর্ম্ম। যশোবর্ম্ম হইলেই ভাল হইত, এত হাঙ্গামা হইত না। যাহা হউক যশোধর্ম্মই যে 'বিক্রমাদিত্য' ইহা একবার বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

হূন, রাজা মিহিরকুল।—হূন নরপতিগণের অন্যতম প্রবল পরাক্রান্ত তোরামণের পুত্র, রাজা মিহিরকুল এক সময়ে কাশ্মীর পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তোরামণ গুপ্ত বংশীয় রাজা বুধগুপ্তের নিকট হইতে মালব

দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের কতকটা প্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। মালব দেশের উপর গুপ্ত রাজগণের নাম মাত্র আধিপত্য ছিল। নতুবা গুপ্ত ভূপতিগণ কোন দিনই মালবের সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন না। মালব এখনকার বরদা মহীশূর প্রভৃতির ন্যায় ছিল। ঐ প্রদেশের স্বতন্ত্র অধিপতি ছিলেন, তিনিই ঐ দেশ শাসন করিতেন। মালবাধিপতি যশোধর্ম্মদেব, তোরামণের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র মিহিরকুলের নিকট হইতে তাঁহার অপহৃত রাজ্য পুনরায় কাড়িয়া লয়েন। শুধু নিজ রাজ্য হস্তগত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, যশোধর্ম্মদেব মিহিরকুলকে, মালব হইতে চিরদিনের মত তাড়াইয়া দেন। ৫৩৩ খৃঃ অব্দে যশোধর্ম্ম দেবের সহিত মিহিরকুলের এই যুদ্ধ হয়, এই সময় হইতে প্রকৃত পক্ষে হূনদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। এই যুদ্ধে যশোধর্ম্মদেব জয়লাভ করিয়াই, খৃঃ পূঃ ৫৬ হইতে যে মালব সংবৎ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা নিজ নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া চালাইতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে যাহা মালব সংবৎ ছিল—এই ৫৩৩ খৃঃ অব্দ বা ৬ষ্ঠ

শতাব্দী হইতে তাহা, যশোধর্ম্মের অনুমতি ক্রমে তাঁহার নিজ নামের সংবৎ হইল।

বিক্রম-সংবৎ।—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফাগু-সন সাহেব বলিয়াছেন যে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও শিলালিপি বা অনুশাসনাদিতে 'বিক্রম সংবৎ' দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং সর্ব্বত্রই প্রাচীন মালব সংবৎ দেখা যায়। তবেই দাঁড়াইল যে, সংবৎ কর্ত্তা বিক্রমাদিত্য ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ছিলেন না। পূর্ব্বতন কালে প্রচলিত মালব সংবৎ ৬ষ্ঠ হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'বিক্রম সংবৎ' নামে চলিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্ম্ম মালব সংবতের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন—একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সেই পরিবর্ত্তিত সংবতই 'বিক্রম সংবৎ' নামে আখ্যাত হয়। কেন না ৬ষ্ঠের পূর্ব্বে আর ঐ সংবতের কোথাও নাম গন্ধ পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই মালব সংবৎ। তাহা হইলেই দাঁড়াইল যে, সংবৎ পরিবর্ত্তনকর্ত্তা যশোধর্ম্মদেব নিজকে বিক্রমাদিত্য আখ্যায় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তদনুসারে—সংবতও 'বিক্রম সংবৎ' নাম ধারণ করি-

য়াছিল। এই সমুদয় কথার প্রতিবাদও অনেক করা যাইতে পারে, কিন্তু সে জন্য আজ এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাসে তিনিও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন "নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিক্রম সংবতের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। যেখানেই সংবৎ আছে সকলই মালব সংবৎ।" যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নানা প্রকার প্রাচীনতত্ত্ব অনুসন্ধান পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—এই যশোধর্ম্ম দেবই ভারতের সেই অস্তগত গৌরবসূর্য্য 'বিক্রমাদিত্য'। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই বিক্রমাদিত্যের সভায় জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার কালিদাস-বররুচি-বরাহ-মিহির-অমর সিংহ প্রভৃতি নবরত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

হর্ষবর্দ্ধন ও বাণ।—পূর্ব্বে থানেশ্বরের, পরে কনোজের অধিপতি, হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খৃঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রায় ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। কবিবর বাণ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের

একজন প্রধান সভাসদ্ ছিলেন। সুতরাং বাণের আবির্ভাবকাল ৬০৭+৪০=৬৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বা ৭ম শতাব্দী। এই বাণ তদীয় হর্ষচরিতগ্রন্থের ভূমিকায় কালিদাসের এই প্রকারে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন—

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে॥

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, কালিদাস ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে অন্ততঃ আবির্ভূত না হইলে আর ৭ম শতাব্দীর প্রাতঃকালে অর্থাৎ ৬০৭ হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় বৎসরের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ বাণ কখনও এত গুণ কীর্ত্তন করিতে পারিতেন না।

প্রবরসেন, সেতু কাব্য, ভুপতি রামদাস।—রাজতরঙ্গিণীতে 'শ্রেষ্ঠ সেন' নামে এক নরপতির নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। 'তরঙ্গিণীতে' উহাঁকে 'প্রথম প্রবর সেন' বলা হইয়াছে। এই প্রথম প্রবরসেনের পৌত্র 'অভিনব প্রবরসেন' বা 'দ্বিতীয় প্রবরসেন' নৃপতির রচিত বলিয়া 'সেতু বন্ধ' নামে এক প্রাকৃত ভাষায় লিখিত কাব্য

প্রচলিত আছে। কবিবর বাণ তদীয় 'হর্ষচরিতের' ভূমিকার ঐ কাব্যের যথেষ্ট স্তুতি করিয়াছেন—বলিয়াছেন—

"কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥"

বহুকাল হইতে একটা জনশ্রুতি আছে যে, ঐ 'সেতুকাব্য' প্রবরসেনের নহে, কালিদাসের প্রণীত। এই প্রবাদের হেতুও যথেষ্ট আছে—১মতঃ টীকা-কার ভূপতি রামদাস নিজে বলিয়াছেন যে, কালিদাসই "সেতুবন্ধের" প্রণেতা। ২য়তঃ অনেক প্রাচীন হস্ত লিখিত পুথির প্রত্যেক (আশ্বাসক) সর্গের শেষে লেখা আছে 'ইঅ সিরিপবরসেন বির ইএ কালিদাস কএ দহমুহবহে মহাকব্বে"। ইহা দেখিয়া প্রতীতি হয় বটে যে, কালিদাসই প্রকৃত গ্রন্থকর্ত্তা, প্রবরসেন নহেন।

মাতৃগুপ্ত-কালিদাস।—কথিত আছে—এই দ্বিতীয় প্রবরসেন রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তীর্থ যাত্রার জন্য কাশ্মীর ত্যাগ করিলে, বিক্রমাদিত্য তদীয় প্রিয়সুহৃৎ মাতৃগুপ্তকে দ্বিতীয় প্রবরসেনের

পিতৃব্য হিরণ্য মহারাজের মৃত্যুর পর, কাশ্মীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বিক্রমাদিত্যের পরলোকপ্রাপ্তির পর বন্ধু-শোকার্ত্ত মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসীতে কিছু দিনের জন্য তীর্থবাস করেন। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত তীর্থকাম প্রবরসেনও তথায় বাস করিতেছিলেন। উভয়ে যথেষ্ট মৈত্রীও জন্মে। মাতৃগুপ্ত নিজে এক জন তৎকালবর্ত্তী কবিকুলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। 'কালিদাস' তাঁহারই নামান্তর। প্রবর-সেনের সহিত মিত্রতা-সংঘটনের পর কালিদাস ওরফে মাতৃগুপ্ত নিজে অতিযত্নে 'সেতুবন্ধ' কাব্য প্রণীত করিয়া, বন্ধুর নামে প্রচার করেন।

ক্ষেমেন্দ্র-"ঔচিত্য-বিচার-চর্চ্চা"।

যাহাহউক—এ সমুদয় সিদ্ধান্ত আমরা তত বিচার-সহ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কেন না প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'ঔচিত্য বিচার চর্চ্চা' এবং তজ্জাতীয় অপরাপর পুস্তকাদিতে "যথা মাতৃগুপ্তস্য, যথা কালিদাসস্য' এই ভাবে মাতৃগুপ্ত এবং কালিদাসের পৃথক্ পৃথক্ নামনির্দ্দেশ আছে।*

*(See Setubandha, Intro, pp. 3 & 4. Kavyamala Ser.)

এ রকম একের প্রণীত পুস্তক অন্যের নামে এখনও চলিয়া থাকে। বিশেষতঃ রাজা রাজড়াদের নামে যে সমুদয় পুস্তক চলিত আছে, তাহার অধিকাংশই ঐ প্রকার। প্রাচীনকালেও এই প্রথার বহুল প্রচার ছিল। কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমসাময়িক হয়েন, তাহা হইলেও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীই যে তাঁহার সময়, ইহা আরও দৃঢ়ীভূত হয়। সেতু কাব্যের প্রণেতা যে কালিদাস এই প্রবাদ আজ কালিকার নহে—বহুপূর্ব্বের, সেই সম্রাট্ আকবরের সময়েও ঐ কিংবদন্তী দেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। উহা অনেক প্রাচীন প্রবাদ। জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত বৌঁলানী নগরের অধিপতি রামদাস নামে এক নরপতি, বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ আকবরের প্রিয় পারিষদ ছিলেন। এখনও ঐ বংশীয়েরা "ধীরাবৎ" আখ্যায় প্রসিদ্ধ এবং 'ধানক্যা' নামক জনপদের অধিস্বামিরূপে বিদ্যমান। জয়পুরের রাজকীয়-বংশ-বৃত্তান্ত গায়কগণ এখনও উঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন। ঐ রামদাস ভূপতি পূর্ব্বোক্ত 'সেতুবন্ধ' কাব্যের 'রামসেতুপ্রদীপ' নামে এক অতি সুন্দর

ব্যাখ্যা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি নিম্নোক্তভাবে, 'কালিদাসই' যে 'সেতুবন্ধের' প্রণেতা, ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—

"দিনেশভক্ত্যা জগতিপ্রকাশঃ
ততঃ সুতোঽজায়ত রামদাসঃ।
আসেবতে জিষ্ণুমিব ক্ষিতীন্দ্রং
যঃ সর্ব্বভাবেন জলালদীন্দ্রম্।

"ধীরাণাং কাব্যচর্চ্চা চতুরিম-বিধয়ে বিক্রমাদিত্যবাচা
যং চক্রে কালিদাসঃ কবিকুমুদবিধুঃ সেতুনামপ্রবন্ধম্।
তদ্ব্যাখ্যাসৌষ্ঠবার্থং পরিষদি কুরুতে রামদাসঃ স এব
গ্রন্থং জল্লালদীন্দ্র-ক্ষিতিপতিবচসা রামসেতুপ্রদীপম্॥"

* * * "ইহ তাবন্ মহারাজপ্রবরসেননিমিত্তং মহারাজাধিরাজ-বিক্রমাদিত্যেনাজ্ঞপ্তো নিখিল-কবিচক্রচূড়ামণিঃ কালিদাস-মহাশয়ঃ সেতুবন্ধ-প্রবন্ধং চিকীর্ষুঃ * * মঙ্গলমাচরন্নাহ"—(Setu-bandha, Kavyamala) আবার গ্রন্থের সমাপ্তি-কালে রামদাস ভূপতি—"শ্রীশ্রী * * * * শ্রীমদকব্বরজল্লালদীন্দ্র কৃপাকটাক্ষবীক্ষিত * * * মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রীরামদাস বিরচিতো রামসেতু

প্রদীপো নাম গ্রন্থঃ পরিপূর্ণঃ।” বলিয়া ব্যাখ্যা গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন।

সুতরাং ‘সেতুকাব্য’ যে কালিদাসের প্রণীত, প্রবরসেনের নহে—ইহা আজকার নহে—বহু দিনের প্রবাদ।

কালিদাস যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহার অনুকূলে আরও শত শত প্রমাণ দেখান যাইতে পারে,—কিন্তু আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কালিদাসের কালনির্ণয় মাত্রই নয়, ইহা গৌণ উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা, সুতরাং আমি এখন ভবভূতির সময় সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিয়াই প্রস্তুতের অনুসরণ করিব। এখন ভবভূতির কথা।

হর্ষবর্দ্ধন।—কান্যকুব্জের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশের আর কোনও বিশেষ খবর ছিল না। তারপর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে যশোবর্ম্মদেব কনোজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে

দেখি, ভবভূতি তাঁহার রাজ-সভার অলঙ্কার ছিলেন।

ভবভূতির নাম শ্রীকণ্ঠ।—ভবভূতির প্রকৃত নাম বোধ হয় শ্রীকণ্ঠ। কারণ, ভবভূতির ও ভাগবতের বিজ্ঞ টীকাকার রামানুজ মতাবলম্বী দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত বীররাঘব এবং গোবর্দ্ধনের 'আর্য্যা-সপ্তশতীর' টীকাকার অনন্তপণ্ডিত (Bom. Edi. P. 13.) লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার পিতৃকৃত নাম 'শ্রীকণ্ঠ'; তবে "সাম্বা পুণাতু ভবভূতি-পবিত্র-মূর্ত্তিঃ" এবং—

"তপস্বী কাং গতোহবস্থাং ইতি স্মেরাননাবিব।
গিরিজায়াঃ স্তনৌ বন্দে ভবভূতিসিতাননৌ ॥"

ইত্যাদি শ্লোক রচনা করায় তাঁহার ভবভূতি নাম হইয়াছে।

তাঁহার পিতার নাম ছিল 'নীলকণ্ঠ'; সুতরাং মিলের খাতিরে ও তাঁহার নাম 'শ্রীকণ্ঠ' বলিয়া বোধ হয়। তিনি কনোজপতি মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের সভাসদ্ ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ললিতাদিত্য।—জেনারাল কানিংহামের নির্দ্দেশানুসারে বুঝা যায় যে, ললিতাদিত্য খৃঃ ৬৯৩ অব্দ হইতে খৃঃ ৭২৯ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই ললিতাদিত্য রাজা যশোবর্ম্ম দেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং যশোবর্ম্মদেবের আবির্ভাব কাল সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। ইঁহার কাল-নির্ণয় হইলে সেই সাথে সাথে মহাকবি ভবভূতিরও কাল-নির্ণয় হইয়া যায়।

বাকৃপতি-রাজের 'গৌড়বহো' ও ভবভূতি।—কাশ্মীরের ইতিবৃত্তে জানা যায় যে, যশোবর্ম্মদেবের রাজসভায় বাকৃপতিরাজ নামে আর একজন কবি ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত ডাক্তার বুলার, প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'গৌড়বহো' নামে একখানি কাব্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐ প্রাকৃত কাব্যের রচয়িতা পূর্ব্বোক্ত বাকৃপতিরাজ। রাজা যশোবর্ম্মদেবের অত্যদ্ভুত বিক্রমাবলী এবং তদীয় গৌড়বিজয় লইয়াই উক্ত কাব্য বিরচিত। ঐ প্রাকৃত কাব্যে, কবি স্বীয় পরিচয় প্রদানকালে,

তিনি যে ভবভূতির শিষ্য এবং ভবভূতির নিকটে বিশেষ উপকৃত, একথা বলিয়া গিয়াছেন। ঐ 'গৌড়বহো' নামক প্রাকৃত কাব্য যদি যশোবর্ম্মদেবের রাজত্বকালের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে, ঐ কাব্য প্রণেতা কবি-বাক্‌পতিরাজের গুরু ভবভূতি যে উক্ত রাজত্বকালের প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। খৃঃ ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত যশোবর্ম্মদেবের রাজত্বকাল ধরা অসঙ্গত নহে।

ভবভূতির সময়।—ললিতাদিত্য ৬৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই ললিতাদিত্যের সহিত যখন যশোবর্ম্মের যুদ্ধ হয়, তখন যশোবর্ম্মের কাল উক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট করাই সমীচীন। এই যশোবর্ম্মের রাজত্বকালের প্রথমভাগে অর্থাৎ ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে যে, ভবভূতি বর্ত্তমান ছিলেন ইহা আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এই ভাবে ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ ভবভূতির আবির্ভাব কাল স্থির করিলে, এসম্বন্ধে অন্যান্য লেখক বর্গের সহিত ও

একমত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ভবভূতি ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যশোবর্ম্ম ও রামাভ্যুদয় নাটক।—

রাজা যশোবর্ম্ম নিজে এক জন সুকবি ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'রামাভ্যুদয়' নামক নাটক হইতে 'ধ্বন্যালোক-লোচন' গ্রন্থে (বোম্বে) নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—যথা—

"যত্ত্বন্নেত্র-সমানকান্তিসলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং" এবং "রক্তস্ত্বং নবপল্লবৈরহমপি শ্লাঘ্যৈঃ প্রিয়ায়াগুণৈঃ ত্বামায়ান্তি" ইত্যাদি। (Peterson's Introduction to Subhasitavali for other slokas of যশোবর্ম্ম-দেব)।

কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য যশোবর্ম্মকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সহিত এই একমাত্র সর্ত্তে সন্ধি করেন যে,—"মহাকবি ভবভূতি এক বার মাত্র কাশ্মীরে ললিতাদিত্যের সভায় পদার্পণ করিবেন।"

প্রিয়তম ছাত্রগণ, তোমরা যে মহাতপস্যায় ব্রতী হইয়াছ, ভবভূতি সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অত খাতির, অত

সম্মান। আজ কাল হইলে, হয়ত কাশ্মীরপতি, যশোবর্ম্মের নিকট ১০। ২০ লাখ 'ইনডিমনিটির' দাবি করিতেন।

কুমারিল ও ভবভূতি।—ভবভূতি, প্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার কুমারিলের শিষ্য ছিলেন—এরূপও অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারাও ভবভূতির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে ঐ একই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়।

এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, কালিদাস খৃষ্টীর ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এবং ভবভূতি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতভূমি অলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আরও কয়েক রকম মত আছে—অনাবশ্যক বোধে তাহার আলোচনা করিলাম না।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাবলীর বিশেষত্ব।—ভারতের কাব্যাবলীর দিকে এখন আমাদিগকে নিবিষ্টমনে তাকাইতে হইবে। আমরা যখনই যে কোনও প্রকৃত কবির কাব্য হাতে লই—তখনই তাহাতে কি দেখি? যাহা দেখি, তাহাতে বিস্মিত হই, স্তম্ভিত হই, ততোধিক আত্মহারা হই।

সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ি। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির কাব্যে এ জিনিষ এমনি ভাবে আছে কি না বলিতে চাই না, কিন্তু আমাদের কাব্যে যাহা আছে—তাহাতে নিজকে ধন্য, গৌরব-যুক্ত মনে করি। দেখি—পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু প্রকাণ্ড, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নূতন নিষ্পাপ, নির্ম্মল, মনোহর, সব যেন এক করিয়া,—যেখানে যেটী বসাইলে, সুন্দরতা ও নির্ম্মলতা আরও বর্দ্ধিত হয়, ঠিক সেই ভাবে বসাইয়া, সামাজিকের সম্মুখে—'অভিরূপ' অর্থাৎ বিশেষজ্ঞের (Expert) সম্মুখে, এক অতি দিব্য, স্বপ্ন ও মনেরও অগোচর, অনির্ব্বচনীয় চিত্র প্রদর্শিত করা হইয়াছে। সামাজিক যখন সেই স্বর্গীয় ছবি দেখিতে দেখিতে তাহার হৃদয়প্লাবী রসে ডুবিতে থাকেন, মর্ত্তে থাকিয়াও স্বর্গের সুখ অনুভব করিতে থাকেন, সেই সময়ে—তাঁহার অজ্ঞাতসারে, অতর্কিত ভাবে তদীয় হৃদয় সাধুতাময় হইয়া উঠে। সে হৃদয় হইতে যাহা কিছু অসুন্দর, যাহা কিছু অধর্ম্ম, যাহা কিছু নীচ—তাহার চিন্তা পর্য্যন্তও দূর হইয়া যায়, সদ্ভাবে মনপ্রাণ পুলকিত হয়। হইতে

পারে রুচিভেদে কাব্য পাঠ শুধু আমোদের কারণ, কিন্তু না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, সৎকাব্যের আলোচনা ব্যতীত মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। তোমরা যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া বীরবর নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত দেখ, দেখিবে, তাঁহাদের সকলেরই হৃদয় কাব্য-প্রিয়তাময় ছিল। থাক্—বিষয়ান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি।

কালিদাস ও ভবভূতি।—কাব্যের এই বিশেষত্ব টুকু ভারতীয় কবির নিজস্ব। অদ্যাবধি ইহার বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির কাব্যে বোধ হয় তোমরা এ জিনিষটী দেখিতে পাইবে না। এই জিনিষের মহাজন হইলেন কালিদাস ও ভবভূতি। ব্যাস বাল্মীকি আমার অদ্যকার আলোচ্য নহেন।

ভারতভূমির যেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রকাণ্ড, যা কিছু—মনোরম পাইয়াছেন—সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাস যা ভাবের কবি ভবভূতি তাহা ছাড়েন নাই, শুধু না ছাড়িয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই,—সে গুলিকে—সেই সমুদয়

মহার্ঘ রত্নগুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া আরও সুন্দর-তর সুন্দরতম করিয়াছেন।

কালিদাস।—পৃথিবীতে কবিদের বর্ণনীয় জিনিষ মাত্র দুইটী। মানুষের মনের ভিতর, আর মনের বাহির। 'নীরেন্দ্র-প্রতিম' সুনীল প্রশান্ত আকাশ, নীল-নীরদ-প্রভ অনন্ত জলনিধি, পূর্ব্বাপর সমুদ্রাবগাহি অভ্রভেদি পর্ব্বতমালা—এই সমুদয় বাহ্য জগতের প্রধান প্রধান বস্তু, আর প্রীতি, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, প্রেম, আত্মোৎসর্গ, সমবেদনা প্রভৃতি মনোজগতের প্রধান প্রধান বস্তু—এই সবই যেন মহাকবি কালিদাসের নিজের সম্পত্তি। তিনি ইহাদের যেটীর যেথানে ইচ্ছা 'যথেষ্ট বিনিয়োগ' করিতেছেন। সব যেন—বেতের মতন ঘুরিয়া তাঁহার বর্ণনার অনুকূল হইয়া আসিতেছে। সুন্দর জিনিষ ছাড়া তিনি স্পর্শ করেন নাই। তিনি কথনও, তাঁহার প্রিয় দর্শক দিগকে, পার্থিব জগতের সুন্দরতম নারীহৃদয়ের পবিত্র প্রণয়, নানা আকারে, ম্যাজিক লণ্ঠনের মত দেখাইয়া,—পরতে পরতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইয়া তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন, আবার

কখনও বা সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিকে গুরুগৃহে গোপালকের বৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া সমাজ হইতে অবিনয়ের মূলোচ্ছেদ করিতেছেন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবতা ও ব্রাহ্মণে—অতর্কিত ভাবে, সকলের আস্থা জন্মাইয়া দিতেছেন। কখনও পিতা 'চির-প্রার্থিত' পুত্রের অঙ্গস্পর্শে আনন্দে 'উপাস্ত-সম্মীলিত-লোচন' হইতেছেন, আবার কোথাও বা কবি, আসন্নপ্রসবা ভার্য্যার পরিত্যাগে সন্তপ্ত অপুত্র নরপতিকে দিয়া, 'আলক্ষ্য দন্ত-মুকুল' 'অব্যক্তবর্ণ-রমণীয়বচঃ-প্রবৃত্তি' 'অঙ্কাশ্রয়প্রণয়ী' ছেলেকে কোলে লওয়াইতেছেন ও সেই সাথে সাথে, রাজার মনে, অসহ্য অপুত্রতা-বেদন অনুভব করাইতেছেন। কোথাও পালিত কন্যার পতি-গৃহ গমনকালে, সর্ব্বত্যাগী, জীবন্মুক্ত মহর্ষিও স্নেহের আকর্ষণে, 'উৎকণ্ঠায়' 'অন্তঃস্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তি-কলুষ' হইতেছেন। কিয়ৎকালের জন্য মহর্ষিত্ব ভুলিয়া, স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, বিয়োগশোকে আতুর হইয়া পড়িতেছেন, আবার কোথাও বা কবি, লোকাপবাদে 'দোলাচলচিত্তবৃত্তি' স্বামীর দ্বারা—না, না, মানুষ নয়, দেবেরও দেবতা,

নিষ্কলঙ্কচরিত্র, প্রণয়পারাবার, পত্নীময়-জীবিত পতির দ্বারা, জীবনের চিরসহচরী সতী সাধ্বী স্বর্ণপ্রতিমার বিসর্জ্জন দেওয়াইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের দুষ্করত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। কোথাও ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছিত প্রিয়তমার অকালমৃত্যুতে, ধরণীর ঈশ্বর 'সহজ ধীরতা'য় জলাঞ্জলি দিয়া বালকের মতন উচ্চ কণ্ঠে—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥

বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। কোথাও বা সৌন্দর্য্যে জগজ্জয়ী পতির অকস্মাৎ মরণে বাল-বিধবা, 'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী' হইয়া 'দেহি দর্শনং' বলিতে বলিতে নয়নজলে পৃথিবী ভাসাইতেছেন। ওদিকে আবার প্রিয়তমার চিন্তায় 'উন্মত্ত' 'চেতনাচেতন-কৃপণ' বিরহ-বিধুর যক্ষ অচেতন মেঘের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে। আবার ঐ দিকে ঐ স্বর্গে দেব সভায়, দেবের বদলে, প্রণয়স্বপ্নে

মানুষের নাম করায় উন্মাদিনীর—দেবতাদের রেজেষ্টরী হইতে নাম কাটা যাইতেছে। আবার ঐ দেখ, কোথাও স্বপ্রিয়াভ্রমে প্রেমিক 'স্তবকাভিনম্রা' লতাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে। কোথাও বা বিরহিণী সাধ্বীর আর্ত্তনাদে ময়ূর নৃত্য ছাড়িতেছে, ভ্রমর ফুলে বসিতেছে না, মৃগবধূ তৃণ-কবল স্পর্শ করিতেছে না—। কোথাও আবার 'কিঞ্চিৎ আবর্জ্জিত-দেহ-যষ্টি' 'পুষ্পস্তবকাবনম্রা,' কুমারী, 'বসন্ত পুষ্পাভরণে' দেহ সাজাইয়া,—'সঞ্চারিণী' 'পল্লবিনী' 'লতার' ন্যায় ঐ দেখ, চির-বাঞ্ছিতের চরণে, বড় আশায় বুক বাঁধিয়া, কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে যাইতেছে। প্রণামকালে তাহার 'নীলালকমধ্যশোভি' 'নবকর্ণিকার' কুসুম হঠাৎ খসিয়া পড়িতেছে। অকস্মাৎ বালিকার শরীর কণ্টকিত হইয়া 'স্ফুরদ্‌বাল-কদম্বের' ন্যায় শোভা পাইতেছে। সে মূর্ত্তির—সে দেবী মূর্ত্তির অমোঘ আকর্ষণে, পরম জিতেন্দ্রিয়ও আজ 'কিঞ্চিৎ পরি-লুপ্ত-ধৈর্য্য' হইয়াছেন, 'চন্দ্রোদয়ারম্ভে' 'অম্বুরাশি' যেমন ঈষদ্‌ তরঙ্গায়িত হয়, সেই প্রকার তাঁহার প্রাণও আজ যেন কেমন একটু তরঙ্গময় হইয়া

পড়িয়াছে। এই প্রকার কত দেখাইব? সংসারে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রাণের উন্মাদজনক, অন্তঃকরণের আকর্ষক, সব যেন কালিদাস, মানু-ষের মনের মত, কল্পনার মত, না না—কল্পনার অতীতের মত ছাঁচে ঢালিয়া সামাজিকদিগকে উপহার দিতেছেন। বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত সামা-জিকদিগকে এমন করিয়া মিশাইয়া ফেলিতেছেন, এমন করিয়া ভাবের সিমেণ্ট দিয়া এক করিয়া গাঁথিতেছেন যে, মর্ত্তে থাকিয়াও মনে হয়, যেন ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশীর নৃত্য দেখিতেছি, অথবা প্রেমোন্মত্ত রাজার সঙ্গে বন্য হস্তীর কাছে প্রিয়া বিষয়ক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় মাতিয়া উঠিয়াছি, কিংবা সেই সুদূর মালিনী তীরে, পৃথিবীপতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তদীয় 'প্রিয়াপরিভুক্ত লতামণ্ডপে' দাঁড়াইয়া, তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া করুণ-স্বরে বলিতেছি—

"তস্যাঃ পুষ্পময়ী শরীরলুলিতা শয্যা শিলায়ামিয়ং
ক্লান্তো মন্মথলেখ এষ নলিনীপত্রে নখৈরঙ্কিতঃ।
হস্তাদ্ভ্রষ্টমিদং বিসাভরণমিত্যাসজ্জমানেক্ষণো
নির্গন্তুং সহসা ন বেতসগৃহাৎ শক্নোমি শূন্যাদপি॥"

আবার কিছু পরেই হয়তঃ দূর আকাশে উঠিয়া ভূকণ্ঠে দোদুল্যমান একছড়া মুক্তার হারের ন্যায় ভাগীরথীর ক্ষীণতনু দেখিতেছি, অথবা 'ধারানিবদ্ধ কলঙ্ক-লেখার' ন্যায় মহোদধির 'তমালতালী-বন-রাজিনীলা' বেলাভূমি দর্শনে আত্মহারা হইতেছি, কিংবা নিশীথ-রাত্রে প্রবাস-গত নরপতির 'স্তিমিত-প্রদীপ' জনহীন শয়নকক্ষে অকস্মাৎ প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা 'অদৃষ্টপূর্ব্বা' বনিতার—তড়িন্ময়ী ললনার আবির্ভাবে চমকিত হইতেছি, তাহার 'তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাথাং জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাং' প্রভৃতি পরিচয় শ্রবণে, সাশ্রুনয়নে কবিকে উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি। এ প্রকার কত দেখাইব ? কালিদাসের কাব্যাবলীর যে কোনও খানিই যখন হাতে লই, তাহাতেই তখন মুগ্ধ হই! আত্মবিস্মৃত হই ! সংসার ভুলিয়া যাই !

কালিদাসের কবিতার একটা প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার কবিতার বর্ণিত চরিত্র পাঠ করিলে পাঠকের অজ্ঞাতসারে, তদীয় হৃদয় অনেকটা সেই রকম হইয়া উঠে। কালিদাসের সৃষ্ট পাত্র গুলি পাঠকের মনে এত অধিক জায়গা জুড়িয়া

বসে যে, পাঠককেই অনেকটা সেই রকম করিয়া তুলে। পাঠকের বা দর্শকের মনে এতটা আধিপত্য ভবভূতি ছাড়া আর কোনও কবিই করিতে পারেন নাই। কালিদাসের এই আধিপত্যের মূল হইল, তাঁহার ওজন-জ্ঞান। মানুষ কতটুকু চায়, তিনি তাহা জানিতেন। নিক্তির কাঁটায় কাঁটায় তাহা ওজন করিয়া লইতে পারিতেন। এই অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা ছিল বলিয়াই কালিদাস 'কালিদাস' তিনি 'ভারবি' বা 'মাঘ' নহেন। তিনি 'বাণ' বা 'শ্রীহর্ষ' নহেন। ছাটিয়া ছুটিয়া মানানসই করিবার ক্ষমতা তাঁহার ন্যায় আর কোনও কবিরই ছিল না। কোথায় কতটুকু বর্ণনার দরকার, কোনস্থলেঁ কতটুকু বই খাপ খাইবে না, কোথায় কোন জিনিষটী বসাইলে ভাল মানাইবে, গোলদার হইয়া খুলিবে, ইহা তিনি যেমন বুঝিতেন, আর কোন কবিই তেমনটী বুঝিতেন না। এক জন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন যে, "কালিদাস চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন, আর কবির কলমে লিখিতেন"—এ কথা ঠিক। জগতের যাবতীয় স্বাভাবিক পদার্থই কল্পনার রঞ্জনে

রঙ্গিন করিব, বর্ণনার চাতুর্য্যে সুন্দর করিয়া তুলিব, কবিজনসুলভ এ দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহার ছিল না। যাহা ভাল, যাহা চিরদিনের মত মানুষের মনের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে, সে সকল জিনিষ বাছাই করিতে তিনি 'বৃহস্পতি' ছিলেন। বাজে জিনিষ তাঁহার অস্পৃশ্য ছিল। অস্পৃশ্য ছিল বলিয়াই অপরাপর কবির কাব্যের ন্যায়, তাঁহার কাব্য পড়িতে আমরা ক্লান্ত হই না। হাপাইয়া পড়ি না। একবার তাঁহার কাব্য হাতে লইলে, সমাপ্ত না করিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহার কবিতার প্রকাণ্ডত্বে নূতনত্বে ও সুন্দরত্বে আমাদিগকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া তুলে। যখন দেখি, প্রজার জন্য, ধনুকভাঙ্গা-পণে জেতা প্রিয়-তমা সাধ্বী ভার্য্যাকে রাম বনে পাঠাইতেছেন, যখন দেখি, পিতার আজ্ঞাপালনের জন্য, রাজতক্ত ছাড়িয়া—তিনি নিজে বাকল পরিতেছেন, যখন দেখি 'মাভূৎ পরীবাদ-নবাবতারঃ" বলিয়া গদগদ-কণ্ঠে 'মৃৎপাত্রশেষ-বিভূতি' রাজা রঘু 'গুরুদক্ষি-ণার্থী' ব্রহ্মচারীর আতিথ্য করিতেছেন—তখন, তাঁহার বর্ণনার প্রকাণ্ডত্বে, নূতনত্বে এবং সুন্দরত্বে

কেমন যেন অবাক্—কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। আনন্দে—বিস্ময়ে—ভক্তিতে মনঃপ্রাণ নত হইয়া আইসে। সংসার ভুলিয়া যাই। তন্ময় হইয়া পড়ি। পাঠকের এই 'তন্ময়ত্ব' কালিদাসের কাব্য ছাড়া অন্য কোথাও আছে কি না জানি না।

কালিদাসের রামের কাছে ভারবির অর্জ্জুন বা মাঘের শ্রীকৃষ্ণ নিষ্প্রভ, কালিদাসের দিলীপের কাছে নৈষধের নল অকিঞ্চিৎকর, কালিদাসের কুশের নিকটে বাণভট্টের তারাপীড় বা শ্রীহর্ষ উল্লেখযোগ্যই নহে। কালিদাসের শকুন্তলা, কালিদাসের মালবিকা, কালিদাসের উর্ব্বশী এক একটী অনুপম সৃষ্টি।

যখন কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীতে দেখি যে, মেঘময়ী উর্ব্বশীর উপরে বসিয়া, রাজা আকাশ পথে নিজের রাজধানীতে ছুটিতেছেন, যখন রঘুবংশে দেখি যে, আকাশ পৃষ্ঠে বিমানে বসিয়া রাম সীতাকে দেখাইতেছেন,

"বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।

ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নং
আকাশমাবিষ্কৃত-চারুতারম্ ॥”

যখন দেখি, তিনি আদরিণী সীতাকে অতি সন্তর্পণে

“পশ্যানবদ্যাঙ্গি! বিভাতি গঙ্গা,
ভিন্নপ্রবাহা যমুনা-তরঙ্গৈঃ”—

বলিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম দেখাইতেছেন, তখন তাঁহার কল্পনার দৌড় দেখিয়া আনন্দে—বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ি। মর্ত্তধাম ছাড়িয়া প্রাণ এক অচিন্তিতপূর্ব্ব অমৃতময় রাজ্যে উপস্থিত হয়। এ প্রকার কত দেখাইব?

অসাধারণ ক্ষমতা বলে, কালিদাস রামায়ণ মহাভারতের উপরও টেক্কা মারিয়াছিলেন। রামায়ণ মহাভারতে যে যে বিষয় খুটাইয়া খুটাইয়া বর্ণনা করায় পাঠকের ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটে, কালিদাস, তাহা সাম্‌লাইয়া লইয়া, পাঠকের মনের মত ছাঁচে ঢালাই করিয়াছেন। এতটা সামর্থ্য যদি কালিদাসের না থাকিবে, আত্মসত্তায় এতটা বিশ্বাস যদি তাঁহার না থাকিবে, তবে, দীর্ঘকাল হইতে, বহুশত বৎসর হইতে, যে দেশে রামায়ণ

মহাভারত পঠিত, গীত এবং ভক্তির সহিত শ্রুত হইতেছে, সেই দেশের সেই সমাজে, তিনি, সেই রামায়ণ মহাভারতের উপরও 'কারি গরি' করিতে যাইবেন কেন? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রামায়ণ মহাভারত যে প্রকার লম্বা, যে প্রকার উৎকট উৎকট কল্পনায় রঞ্জিত, তাহাতে তাহাদের দ্বারা যোল আনা আনন্দরসের অনুভব হয় না বা হইতে পারেও না। তবে তাঁহার একটা বিষয়ে জ্ঞান খুব ভাল ছিল, তিনি জানিতেন যে, ব্যাস বাল্মীকির কলমের উপর কলম চালাইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে, তাঁহাদের উপেক্ষিত বিষয়গুলি সযত্নে কুড়াইয়া লওয়া—অর্থাৎ ব্যাস-বাল্মীকি যে যে বিষয়ের সম্যক্ বর্ণনা করেন নাই, তাহার সম্যক্ বর্ণনা। আর তাঁহারা যে যে ষিষয়, কল্পনার তুলিতে সুচারুরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা একেবারে স্পর্শ না করা। কালিদাসের সমগ্র গ্রন্থাবলীতেই এই ধ্রুব সত্য বিদ্যমান। রামায়ণ মহাভারতে যাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কালিদাসের কাব্যে তাহার অতি সামান্যভাবে নামোল্লেখ দেখা যায় মাত্র। আবার রামায়ণ মহাভারতে

যাহা নাই, অথবা যাহা সামান্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কালিদাস তাহার সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ব্যাস-বাল্মীকির বর্ণনার সহিত কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া কালিদাসের কোনও প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, কাজে কাজে উপমাও চলে না। কালিদাস নিজেই সে পথ মারিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণ মহাভারতের আর একটা ত্রুটি এই যে, কোথাও একটা ছোট্ট কথা খুব জাঁকালো করিয়া, লম্বা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—আবার হয়ত একটা বিশেষ কথা—প্রধান কথা—একেবারে এক লাইনে সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। কালিদাস তাঁহার নিজের গ্রন্থে সে দোষ সারিয়া লইয়াছেন। যেখানে যতটুকু দরকার, তারপর আর একটী অক্ষরও বেশী বলেন নাই। সামাজিকগণ কতটুকু চান্, তাহা কালিদাস জানিতেন। পৌরাণিক রচনায় সে জ্ঞানটুকু ছিল না। ছাঁটা ছিল না। কালিদাসের ন্যায় ওজন কাঁটায় কাঁটায় সই—ছিল না। যাহা হউক এই ক্ষণে আমি, ভবভূতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিয়া

কালিদাস ও ভবভূতির তুলনার পর অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভবভূতি।—আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিগণের মধ্যে পণ্ডিতকুলরবি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আসন বোধ হয় অতি উচ্চে। তিনি তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচিত।" আমাদের অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ও একস্থলে বলিয়াছেন 'সংস্কৃত সাহিত্যে 'উত্তর-রামচরিতের' মত উৎকৃষ্ট নাটক—মনোহর উপদেশ পূর্ণ সরস কাব্য আর নাই।" এই দুইটী উক্তিই সারগর্ভ। ভারতবর্ষের যে কোনও ভাবুক বিদ্বান ব্যক্তি, যদি নিবিষ্ট-মনে একবার, মহা কবি ভবভূতিকে দেখেন—তাঁহার অমৃতময়ী বীণার ঝঙ্কারে—কর্ণপাত করেন—তবে সকলেই এই একই সিদ্ধান্তে—উপনীত হইবেন। বস্তুতঃ কালিদাসের পর যদি কাহাকেও মহা-কবির কিরীট পরাইতে হয়, তবে একমাত্র ভবভূতিই তিনি।

ভবভূতির বংশাবলী।—আমরা ভবভূতির নিকট হইতেই, তদীয়বংশ-বৃত্তান্ত প্রভৃতির বিশদ বিবরণ পাইতেছি,—যথা "অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরং। তত্রকেচিৎ তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তি-পাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়-যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্ট-গোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠ-পদ-লাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ কবিঃ" ('বীর চরিত,' বড়ুয়া, পৃঃ ৪)।

তাহা হইলেই দেখিতেছি যে, তিনি নিজেই তাঁহার তিন পুরুষের পরিচয়, বংশের পরিচয়, ব্যবসায়ের পরিচয়, সমস্তই দিয়াছেন। তিনি যে শুধু বড় পণ্ডিতের বংশে জন্মিয়াছিলেন এবং নিজেও বড় পণ্ডিত ছিলেন—মাত্র তাহাই নহে, তিনি মহা-কবির বংশে জন্মিয়াছিলেন, নিজেও মহা-কবি ছিলেন। যাগযজ্ঞাদি তাঁহাদের বাড়ীতে নিত্য ক্রিয়া ছিল। যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার

তাঁহারা 'চরণগুরু' অর্থাৎ এক কথায় 'অথরিটি' ছিলেন। তাঁহারা 'পংক্তিপাবন' ছিলেন। কথাটা যদিও ছোট্ট,—কিন্তু এর মানেটা খুব বড়। আমরা মনুসংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ১৮৪ শ্লোকে দেখিতে পাই—

'অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।
শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পংক্তিপাবনাঃ॥

এ বড় সোজা কথা নয়। এত বড় বংশে তাঁহার জন্ম! শুধু যে বড় বংশেই জন্ম, মাত্র তাহা নহে, নিজেও মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যাবলীতে বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্য, বেদান্ত, সকল বিষয়েরই ভুরভুরে গন্ধ পাওয়া যায়। তাঁহার মালতীমাধবের ৫ম অঙ্কে এবং বীরচরিতের ৩য় অঙ্কে অনেক দার্শনিক কথা আছে উত্তর-রাম চরিতের ২। ৩ স্থলে বেদান্তদর্শনের বিবর্ত্ত-বাদের ছায়াপাত হইয়াছে। মহর্ষি ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে যে তাঁহার প্রগাঢ় দখল ছিল, বাৎস্যা-য়নের কামসূত্রের ন্যায় গ্রন্থাদিতে ও যে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, ইহা তদীয় "সান্দ্রানন্দক্ষুভিতহৃদয়"

প্রভৃতি শ্লোক পড়িয়াই বেশ বুঝা যায়। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, তিনি কবি ছিলেন। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কবিত্বের গৌরব করিতে ভাল বাসিতেন। তাই তিনি পণ্ডিত কুলগুরু বৃহস্পতির বদলে, কবি-কুল-গুরু বাল্মীকির পাদবন্দনা করিয়া আসরে নামিয়াছেন। তিনি নিজের ইন্‌ট্রডক্‌সনে 'বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং' বলিয়া বুক ঠুকিয়া সামাজিকগণের মন আকর্ষণ করিতেছেন। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি সকলের ভাষাতেই তিনি তাঁহার প্রিয়কাব্য গুলির কোনও না কোনও অংশ লিখিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের পত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেদ হইতে কাদম্বরী পর্য্যন্ত মনে পড়ে। কিন্তু তাঁহার এমনই নিপুণতা যে, আসল হইতেও তাঁহার নকল জমিয়াছে ভাল। তিনি যে 'বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'কুতোঽস্ববচনীয়তা' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন—তাহা সার্থক হইয়াছে। তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্‌ ছিলেন, কোথাও তিনি নিজের গুরুর নামোল্লেখ করেন নাই। 'জ্ঞাননিধি' এই বিশেষণ দিয়া গুরুকে প্রণাম

করিয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্টের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হর্ষবর্দ্ধনের প্রায় এক শত বৎসর পরে, কনোজের অধিপতি যশোবর্ম্মদেবের সভায় ভবভূতি বিদ্যমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রাকৃত কাব্য 'গৌড়বহো' গ্রন্থে ভবভূতি সম্বন্ধে বাক্‌পতির যে প্রাকৃত কবিতা আছে, তাহার সংস্কৃত এই—

"ভবভূতি-জলধিনির্গত-
কাব্যামৃতরসকণা ইব স্ফুরন্তি।
যস্য বিশেষা অদ্যাপি
বিকটেষু কথা নিবেশেষু ॥"

(গৌড়বহো—Bombay Sanskrit Series. Sloka 799.)

তাঁহার প্রিয় 'পদ্মাবতী' এখনও বিদ্যমান। শুনিয়াছি, বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে পারা ও সিন্ধু নামক দুইটী নদীর সঙ্গম স্থলে ঐ নগর অবস্থিত।

একেত দক্ষিণাপথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম, পূর্ব্ব পুরুষগণের অনেকেই মহা কবি, তার উপর নিজেও একজন সর্ব্বলোক-

বিদিত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, কবিত্বরত্নে অলঙ্কৃত। তাহাতে আবার কনোজের স্বাধীন নরপতির প্রধান সভাসদ্, প্রধান রাজকবি, 'রয়েল বার্ড'। কোন দিকেই কোনও প্রকার খোঁচ ছিল না। যে যে অবস্থায় পড়িলে মানুষের মনোবৃত্তি উচ্চ হয়, উদার হয়, মানুষ দেবতা হয়, ভবভূতির অদৃষ্টে সে সবই সংঘটিত হইয়াছিল। নীচ চিন্তা—নীচ কল্পনা, তাঁহার অন্তঃকরণে কখনও উন্মেষলাভও করে নাই। তিনি যাহা কিছু ভাবিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন, সে সকলই উচ্চ, সকলই পবিত্র। তাই তাঁহার কাব্যাবলীর কোথাও আমরা কোন প্রকার তরল বা অপবিত্র ভাব দেখিতে পাই না।

অলঙ্কারের 'বাহানায়' তিনি পবিত্র কাব্যকে 'টোপ' দিয়া ঢাকিতেন না। বৃথা শব্দ বা অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগে তিনি কবিতার মর্য্যাদা হানি করিতেন না।

তাঁহার বইতে উপমা প্রয়োগ বড়ই কম, কেন না তিনি জানিতেন যে, কালিদাসের ভারতবর্ষে উপমা দিতে যাওয়া বেয়াছুবি মাত্র। বর্ণনীয়

বস্তুগুলি, ভবভূতির লেখনীর মুখে পড়িয়া তাহা-দের প্রকৃতিসিদ্ধ শোভার অধিক শোভা ধারণ করিত। কালিদাসের ন্যায়, বাছিয়া বাছিয়া, সুন্দর ছবিগুলি এক করিবার রোগ ভবভূতির ছিল না। তিনি যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন, তাহাই বর্ণনা করিতেন। দুই দশটা মোটা মোটা কথায়, ঝাঁ করিয়া একটা প্রকাণ্ড—সম্পূর্ণ পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া—একটী আদর্শ পুরুষের ছবি অঙ্কিত করিয়া সামাজিকদিগের হৃদয় পবিত্র ও উদার করিতে যত্ন পাইতেন। আদর্শচরিত্র দেখাইয়া লোক শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার নিজের উক্তিতেই বুঝিতে পারি যে, তাঁহার জীবদ্দশায়, তদীয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই।

সভ্যমহোদয়গণ! এস্থলে আমি, আপনাদিগকে আমার পরম বন্ধু, যাঁহার নিকটে, কাব্যালোচনা সম্বন্ধে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, তাঁহার কতিপয় উক্তি উপহার না দিয়া থাকিতে পারি-লাম না। 'ভবভূতির স্বর্গারোহণের পর হইতে ভারতবর্ষের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার

নাম, তাঁহার কাব্য এবং তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য এক প্রকার লোপই পাইয়াছিল।—তাহার পর—বহুকাল পরে, ইংরাজ রাজত্বে, চারিদিকে লেখা পড়ার চর্চ্চার বৃদ্ধিতে, কাব্য আলোচনায়, কলা শিক্ষায় ও উচ্চ আদর্শ-দর্শনে, আমাদের ভবভূতিকে আদর করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে ও ঠিক সময়ও আসিয়াছে। আমাদের কাছে—সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের কাছে ভবভূতির আদর করা, আত্মীয় কুটুম্বের আদর করার মতন। ভট্ট কুমারিল স্বামী, তাঁহার প্রিয়শিষ্য, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ভবভূতিকে যে পথে চালাইয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ আজও সেই পথে চলিয়াছে। সেই বেদে অচলা ভক্তি, সেই যাগযজ্ঞের ফলে অটল বিশ্বাস, সেই দেবতা ব্রাহ্মণের সেবায় অনুরাগ, আজও ভারতে তেমনি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাহাই যদি হইল, তবে কুমারিলের প্রথম এবং প্রধান শিষ্য ভবভূতি আমাদের শীর্ষস্থানীয়, আমাদের পরম ভক্তিভাজন, আদর্শপুরুষ।'

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণের আদর্শ হইতে গেলে যত গুলি গুণ থাকা আবশ্যক, ভবভূতির সে সব

গুণই প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার রচনাতে, চরিত্রের ও হৃদয়ের গাম্ভীর্য্যে, উদারতায় এবং প্রশস্ততায়, তাঁহাকে আমাদের পরমপূজনীয় করিয়া তুলিয়াছ। সকল সময়ে, সকল অবস্থায় সকলপ্রকার মনুষ্যের প্রতি তাঁহার দয়া অসীম। কিন্তু সে দয়ার মধ্যেও, সে অনুপম পর-দুঃখ-কাতরতার মধ্যেও, অন্যায়ের প্রতি, পাপের প্রতি তাঁহার ভ্রুকুটীর ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতি আমাদের আদর্শ—অনুকরণীয়। তিনি আমাদের জন্য, তাঁহার সকল সামর্থ্য ব্যয় করিয়া—অতি সুন্দর, পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর, আদর্শ পুরুষ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় আমরা ভারত বাসী মাত্রেই পূত, আপ্যায়িত এবং চরিতার্থ হইয়াছি।

মহাকবি ভবভূতি সরস্বতীর উপাসক ছিলেন, লক্ষ্মীর সেবক ছিলেন না। তাই তিনি সরস্বতীর 'বরপুত্র',—তাঁহার উপাস্যদেবতার প্রিয়পুত্র—কালিদাসকে বড় ভালবাসিতেন। অথবা শুধু কালিদাস কেন? যাঁহারা সারস্বত সাম্রাজ্যের অধিপতি, তিনি তাঁহাদিগের সেবা করিতেই

ভাল বাসিতেন। তাই তিনি সারস্বত রাজ্যের প্রথম ও প্রধান সম্রাট বাল্মীকিকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিয়াছেন, যাঁহার রামায়ণই হইল ভবভূতির সব।

তার পরই কালিদাস। যদিও ভবভূতি তদীয় গ্রন্থের মধ্যে কোনস্থলে কালিদাসের নাম করেন নাই, সত্য, কিন্তু চোখ দিয়া পড়িলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লাইনে লাইনে, তিনি, কালিদাসের গুণপণা, কালিদাসের মধুরতা অনুভব করিতেছেন, এবং অন্যকেও আস্বাদ লইবার অবসর করিয়া দিতেছেন। তাঁহার যে সকল বিচিত্র, মনোহর, অনুপম সৃষ্টি চাতুর্য্য দেখিয়া, তাঁহাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে সকল সৃষ্টিরই নিদান কালিদাসের অপার্থিব কাব্য সমূহে সরস্বতীর প্রবাহের ন্যায়, লোকালোক পর্ব্বতের ন্যায়, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কালিদাসের ভাব, কালিদাসের ছবি, কালিদাসের সৃষ্টি, সবই যেন এক এক খানি সোণার প্রতিমা। সেই প্রতিমা গুলি কারিকর চূড়ামণি ভবভূতির প্রস্তুত নানাবিধ হীরক-মুক্তা

খচিত ডাকের গহনায় এমনই সুন্দর মানাইয়াছে যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। ভাষায় তাহার বর্ণনা করা যায় না। সে গুলি যখন দেখি, তখন বুঝিতে পারি না যে, কে বড়—কালিদাস না ভবভূতি ? তখন বুঝিতে পারি না যে, কে বেশী প্রেমিক—কালিদাস না ভবভূতি ? কালিদাস যদি ভবভূতির এই 'কারিগরি' দেখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও এ মীমাংসায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত, 'থত মত' খাইতে হইত ; এক কথায় বলিতে গেলে, ভবভূতির কাব্যে যা' কিছু সুন্দর যা' কিছু মনোহর—লোভনীয়, সে সমস্তেরই মূল কালিদাস। সে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই বা এসময়ও নহে, তাহাতে একটী নহে, দুইটী নহে, বহু প্রবন্ধের প্রয়োজন। আমি আশা করি, আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসার স্থল ছাত্রগণের মধ্যে কেহ সে কার্য্যের ভার লইবেন। আমরা মাত্র পথ দেখাইয়া দিলাম, আনন্দ কাননে পৌ'ছিবার সুশীতল স্নিগ্ধ 'সড়ক' দেখাইয়া দিলাম, তাঁহাদিগের কাহাকেও সে পথের যাত্রী হইতে দেখিলে পরম সুখী হইব। আমি মাত্র নমুনা

স্বরূপ দুই একটীস্থল দেখাইয়াই প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব।

প্রথমতঃ চিত্রদর্শন।

চিত্রদর্শন ও কালিদাস।—চিত্র দর্শনে ভবভূতি একঢিলে দুইটী পাখি মারিয়াছেন। একটীতে কালিদাসের উপরেও 'টেকা', আর একটীতে নিজের বীরচরিতের ভুল শোধ্‌রাইয়া লওয়া। কালিদাসের উপর 'টেকা' দিলেন কিসে, সেইটীই প্রথম দেখি—

কালিদাস রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গের ২৫শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"তয়োর্যথাপ্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থান্
আসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু
সংচিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্॥"

অর্থাৎ রাম-সীতার ঘরে নানা প্রকার ছবি খাটানো ছিল, তাঁহারা সেই সকল ছবি দেখিয়া নানাবিধ সুখভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে যে সকল দুঃখ পাইয়াছিলেন, আজ সুখের দিনে,

মিলনের দিনে---দুইজনে এক-প্রাণ হইয়া, সেই সকল ভাবিতেছেন—আর অতুল আনন্দ ভোগ করিতেছেন।

কবিতা-রূপিণী চিত্রশালিকার অমর ভাস্কর কালিদাসের এই উদার-রমণীয় ভাবে, ভবভূতি মজিয়াছিলেন---শুধু নিজে নিজে মজিয়াই ছাড়েন নাই, এই ভাবটীকে ভাল করিয়া ফলাইয়া সাধারণকেও মজাইয়াছেন। তিনি বুঝিলেন যে, শুধু বাজে ছবি দেখায়, বা খেয়াল মত একটু দণ্ডকারণ্যের কথা ভাবায় চলিবে না। আমি এমন ছবি প্রস্তুত করিব, যাহাতে দণ্ডকারণ্যেরই সমস্ত বৃত্তান্ত চিত্রিত থাকিবে। কালিদাস, যে দণ্ডকের কথা,রাম-সীতাকে মাত্র ভাবাইয়া সুখী করিয়াছেন, আমি সেই দণ্ডকের কথা---সেই দণ্ডকের ঘটনাবলী---রাম-সীতার সেই নির্জ্জন বনবাসের ঘটনালহরী, ছবিতে আঁকিয়া, দু'জনকে একত্র করিয়া, ---দণ্ডকের প্রধান সহায়, সুখ-দুঃখের একমাত্র অবলম্বন, রাম সীতার সেই লক্ষ্মণকে দিয়া সেই ছবি রাম-সীতাকে দেখাইব। দেখি, কালিদাসের রাম-সীতা বেশী সুখ পান, না আমার রাম সীতা

বেশী সুখ পান।—তাই ভবভূতি এই মৎলবে ছবি গুলির সহিত দণ্ডকারণ্যের ঘটনা সমূহের একটা একটানা সম্বন্ধ পাতাইয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—জীবনের প্রাতঃ-কালে রাম-সীতা দণ্ডকারণ্যে যে দুর্বিবষহ দুঃখভোগ করিয়াছেন, সেই সীতাহরণ, সেই পরস্পরের বিরহ, 'পাতি পাতি' করিয়া অন্বেষণ, সেই লঙ্কা সমর, তার পর, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি পরীক্ষা,—সেই সব দুঃখের দিনের চিত্রাবলী,—আজ সুখের দিনে—রাম আজ অযোধ্যার রাজ-রাজেশ্বর, সীতা রাজরাজেশ্বরী, তাই এই সুখের দিনে, সেই সব দুঃখের দিনের চিত্রাবলী দুই জনে এক হইয়া দেখিতেছেন। যতই সেই পুরাতন বেদনার ব্যাপার দুই জনে এক প্রাণ হইয়া ভাবিতেছেন, ততই উভয়ের মনে অতুল আনন্দের উদয় হই-তেছে। দুঃখের দিনের সেই ছবি—পরস্পরের জন্য পরস্পরের সেই আকুলতার ছবি দেখিয়া—এত দিন যাহা অনুভব করিয়া লইতেন, আজ তাহা চিত্রে দেখিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শতমুখ অনুরাগ সহস্রমুখ হইতেছে। দুইজনের

হৃদয়ই দুইজনের ভাবে ডুবিয়া যইতেছে। সীতা-বিরহে মাল্যবান দর্শনে রামের সেই—

"বৎসৈতস্মাদ্ বিরম বিরমাতঃ পরং ন ক্ষমোঽস্মি।
প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরপি স মে জানকী-বিপ্রযোগঃ॥

প্রভৃতি অসহ্য যাতনাময়ী উক্তি, প্রস্রবণ গিরি-দর্শনে সেই—

"স্মরসি সুতনু! তস্মিন্ পর্ব্বতে লক্ষ্মণেন
প্রতিবিহিত সপর্য্যাস্বস্থয়োস্তান্যহানি?
স্মরসি সরসতীরাং তত্র গোদাবরীং বা
স্মরসি চ তদুপান্তেষ্বাবয়োর্বর্ত্তনানি?

সেই—

"অলস-লুলিত-মুগ্ধান্যধ্ব-সঞ্জাতখেদাৎ
অশিথিল-পরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিত-মৃণালী-দুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥

সেই—

"কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসক্তিযোগাৎ
অবিরলিত-কপোলং জল্পতোরক্রমেণ।

অশিথিল-পরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো
রবিদিত-গতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥

সেই 'বাষ্পাম্ভঃ-পরিপতনোদ্গমান্তরালে'—প্রফুল্ল কুবলয় দর্শন ;—

সেই—

'অয়মুদ্গৃহীতকমনীয়-কঙ্কনঃ
তবমূর্ত্তিমানিব মহোৎসবঃ করঃ ॥

প্রভৃতি ঘটনাশ্রেণী একে একে, ধীরে ধীরে, রাম গর্ভভরালসা সীতাকে বুঝাইয়া দিতেছেন। সীতা বুঝিতেছেন, বুঝিয়া মজিতেছেন, রামের দিকে,—যিনি তাঁহার জন্য অত যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, সেই 'প্রিয়ঙ্কর' প্রিয়ের দিকে এক এক বার চাহিতেছেন, আর নীরবে, মনে মনে নিজেকে ধন্য ভাবিতেছেন, নিজের নারীজীবন সার্থক মনে করিতেছেন, সেই 'ধনুকভাঙ্গা' পণের শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন।

সভ্যগণ! বলুন দেখি, এ কালিদাসের উপরে 'টেক্কা' হইল না কি? কালিদাস যে ঘুঁটি চালিয় ছিলেন, ভবভূতি সেই ঘুঁটি পাকাইয়া লইয়

বাজি মাৎ করিয়া দিলেন। কেন না—চিত্র দর্শ-
নের বীজটি মাত্র কালিদাসের, আর সেই বীজে
যে অনুপম পারিজাত তরু নির্ম্মিত হইল, তাহার
পত্র পুষ্প পল্লব প্রভৃতি সমস্তই ভবভূতির।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চিত্রদর্শনে, ভবভূতি এক
ঢিলে দুইটী পাখি মারিয়াছেন—তাহার একটী ত
উপরে প্রদর্শিত হইল। চিত্রদর্শনের আর একটী
উদ্দেশ্যও আছে। সেটীতেও কবিবর ভবভূতি
সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছেন। সেটী কি ক্রমে
বলিতেছি।

চিত্রদর্শন ও মহাবীর-চরিত।—
ভবভূতি রামচন্দ্রের চরিত্র উপজীব্য করিয়া দুই
খানি কাব্য লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে এক মহা-
ভারতের কৃষ্ণকে লইয়া যেমন কবিবর নবীনচন্দ্র
রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামে তিনখানি
কাব্য লিখিয়াছেন, ভবভূতিও সেইরূপ একমাত্র
রামচরিত লইয়া দুইখানি বই লিখিয়াছেন—'বীর
চরিত' ও 'উত্তরচরিত'। ইহার মধ্যে রামায়ণের
প্রথম ছয় কাণ্ডের বৃত্তান্ত লইয়া 'বীরচরিত', আর
উত্তর কাণ্ডের ঘটনাবলী লইয়া 'উত্তরচরিত'

অশিথিল-পরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো
রবিদিত-গতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥

সেই 'বাষ্পাম্ভঃ-পরিপতনোদ্গমান্তরালে'—প্রফুল্ল কুবলয় দর্শন ;—

সেই—

'অয়মুদ্গৃহীতকমনীয়-কঙ্কনঃ
তবমূর্ত্তিমানিব মহোৎসবঃ করঃ ॥

প্রভৃতি ঘটনাশ্রেণী একে একে, ধীরে ধীরে, রাম গর্ভভরালসা সীতাকে বুঝাইয়া দিতেছেন। সীতা বুঝিতেছেন, বুঝিয়া মজিতেছেন, রামের দিকে,—যিনি তাঁহার জন্য অত যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, সেই 'প্রিয়ঙ্কর' প্রিয়ের দিকে এক এক বার চাহিতেছেন, আর নীরবে, মনে মনে নিজেকে ধন্য ভাবিতেছেন, নিজের নারীজীবন সার্থক মনে করিতেছেন, সেই 'ধনুকভাঙ্গা' পণের শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন।

সভ্যগণ! বলুন দেখি, এ কালিদাসের উপরও 'টেক্কা' হইল না কি? কালিদাস যে ঘুঁটি চালিয়াছিলেন, ভবভূতি সেই ঘুঁটি পাকাইয়া লইয়া

বাজি মাৎ করিয়া দিলেন। কেন না—চিত্র দর্শ-নের বীজটি মাত্র কালিদাসের, আর সেই বীজে যে অনুপম পারিজাত তরু নির্ম্মিত হইল, তাহার পত্র পুষ্প পল্লব প্রভৃতি সমস্তই ভবভূতির।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চিত্রদর্শনে, ভবভূতি এক ঢিলে দুইটী পাখি মারিয়াছেন—তাহার একটী ত উপরে প্রদর্শিত হইল। চিত্রদর্শনের আর একটী উদ্দেশ্যও আছে। সেটীতেও কবিবর ভবভূতি সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছেন। সেটী কি ক্রমে বলিতেছি।

চিত্রদর্শন ও মহাবীর-চরিত।—ভবভূতি রামচন্দ্রের চরিত্র উপজীব্য করিয়া দুই খানি কাব্য লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে এক মহা-ভারতের কৃষ্ণকে লইয়া যেমন কবিবর নবীনচন্দ্র রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামে তিনখানি কাব্য লিখিয়াছেন, ভবভূতিও সেইরূপ একমাত্র রামচরিত লইয়া দুইখানি বই লিখিয়াছেন—'বীর চরিত' ও 'উত্তরচরিত'। ইহার মধ্যে রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডের বৃত্তান্ত লইয়া 'বীরচরিত', আর উত্তর কাণ্ডের ঘটনাবলী লইয়া 'উত্তরচরিত'

রচিত। এক কথায় বলিতে গেলে বীরচরিত উত্তরচরিতের 'প্রিফেস্'। কিন্তু তাহা হইলেও দুইখানি বইতে তফাৎ অনেক। 'বীরচরিত' কাঁচা হাতের লেখা, 'উত্তরচরিত' পাকা হাতের চিত্র। 'বীরচরিত' ভবভূতির কবিতার 'মক্‌স', আর 'উত্তরচরিত' তাঁহার হাতের অক্ষয়শিলালিপি। 'বীরচরিতে' তিনি রামকে যে ছাঁচে গড়িয়াছেন, রামায়ণের রামও সেই ছাঁচে গঠিত। সে রামে দোষ আছে, চরিত্রের কোথাও বা একটু আধটু 'খুটিনাটি' আছে। লঙ্কা সমর জয় করিয়া, জানকীকে লইয়া রামচন্দ্রের অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবার পরের ঘটনাবলী লইয়া 'উত্তরচরিতের' ব্যাপার। সুতরাং 'উত্তর-চরিতের' সামাজিকদিগকে, প্রতিপদেই রামের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী মনে রাখিতে হইবে। অথবা রাখিতে হইবে কেন, বর্ষীয়ান্ রামের চরিত-দর্শনকালে নবীন রামের চরিতাবলী আপনিই আসিয়া মনে উদিত হইবে। সুতরাং সেই 'বীরচরিতের' রামের কথা নিয়তই তাঁহাদের মনে পড়িবে। সেই ঈষদসম্পূর্ণ রামের ছবি দর্শকগণের মানসপটে ভাসিয়া উঠিবে,

নিপুণচূড়ামণি ভবভূতির সেটী অভিপ্রেত নহে। যে আদর্শ হইবে, তাহাতে কোনও প্রকার দোষ অমার্জ্জনীয়। বীরচরিতের রামে দোষ আছে, সে রামকে, কবি, সামাজিকদিগকে দেখিতে দিতে চান না। তিনি এমন 'নিখুঁত' রাম দেখাইবেন, যাহা রামায়ণে নাই, যাহা পৃথিবীতে নাই, যাহা কেহ কখনও কল্পনায়ও আনিতে পারে না। তাই কবিতারাজ্যের বিশ্বকর্ম্মা ভবভূতি, উত্তরচরিতের ১ম অঙ্কেই, উত্তরকাণ্ডের ঘটনাবলী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই সামাজিকদিগকে, চিত্র দর্শনচ্ছলে, রামের সেই শৈশবের 'মাতৃভিশ্চিন্ত্যমান' অবস্থা হইতে উত্তরজীবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঝাঁ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। রাম সম্বন্ধে সামাজিকদিগের মনে পাষাণের রেখার ন্যায় একটী রেখা টানিয়া দিলেন। 'বীরচরিতে'র রামের সহিত উত্তরচরিতের রামের যেখানে যে 'বেখাপ' 'বেমানান্‌টুকু' অপরিহার্য্য হইত, তাহা শোধ্‌রাইয়া লইয়া, চিত্রদর্শনে, মাজা-ঘসা, নিখুঁত রামের ছবি সম্মুখে ধরিলেন। পার্থিবকে অপার্থিব দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলেন। ইহা কি কম চাতুর্য্য! কম

নৈপুণ্য ! এ সমুদয় যখন ভাবি, তখন মল্লিনাথের সুরে উচ্চকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয় যে,—

'বয়ঞ্চকৃতিনস্তৎ-সূক্তিসংসেবনাৎ ॥'

সভ্যগণ ! আর একটী স্থল আমি না দেখাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেটী এই—

ছায়া ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল।—

অঙ্গুরীয় প্রাপ্তির পর শাপবিমুক্ত-স্মৃতিদুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার উদ্দেশে কতপ্রকার বিলাপ, কত প্রকার অনুতাপ করিতেছেন,—তখন অন্তরালে থাকিয়া—শকুন্তলার গন্ধর্ব্ব-সখী সানুমতী সব দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে দুষ্মন্তের কাতরতা দেখিয়া বলিতেছিল যে, 'আহা, আমার প্রিয়সখী শকুন্তলা যদি আজ এখানে এমনিভাবে আমার মত লুকাইয়া থাকিত, তাহা হইলে সে দেখিত, তাহার প্রণয়ী—এক সময়ে যে তাহাকে চিনিতেও পারে নাই, সেই ব্যক্তি, আজ সেই 'অপরিচিতার' জন্য কিরূপ পাগল হইয়াছে। ইহা দেখিলে আমার সখীর মনে আর পতিকৃতপরিত্যাগের দুঃখ থাকিত না। সব দূর হইত।' ইত্যাদি।

ভবভূতি কি—এ ভাব,' এমন হৃদয়োন্মাদিনী কল্পনা ছাড়িতে পারেন। তিনি অমনি কালিদাসের ঐ টুকুমাত্র উপজীব্য করিয়া, সীতাকে আড়ালে রাখিয়া, উত্তর চরিতের তৃতীয়ে 'ছায়াদর্শনে', রামের সীতার জন্য আকুলতা উন্মাদ প্রভৃতি একে একে সব দেখাইলেন। জানকীর অরণ্য-বাস-সহচরী, বনদেবতা বাসন্তীর সেই--

'অস্মিন্নেব লতাগৃহে
 ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ,
সা হংসৈঃ কৃত-কৌতুকা
 চিরমভূদ্‌গোদাবরী সৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব
 ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দ-কুট্মল-নিভো
 মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ॥'

'এতত্তদেব কদলী-বন-মধ্যবর্ত্তি
কান্তা-সখস্য শয়নীয়-শিলাতলং তে।
অত্র স্থিতা তৃণমদাদ্‌ বহুশো যদেভ্যঃ
সীতা, ততো হরিণকৈর্ন বিমুচ্যতে স্ম ॥'

'ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব—শান্তমথবা, কিমিহোত্তরেণ?'

প্রভৃতি সকরুণ উক্তি শ্রবণে শোকোন্মত্ত রামের সেই—

'হাহা দেবি! স্ফুটতি হৃদয়ং স্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্বঙ্ মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি?'

প্রভৃতি বিলাপ, মূর্চ্ছা, আর্ত্তনাদ—একে একে সব, কবি সীতাকে দেখাইলেন। সীতা অন্তরালে থাকিয়া স্বচক্ষে সব দেখিলেন, দেখিয়া মজিলেন, বেশীর ভাগে, বনবাসের পূর্ব্বে রামের উপর সীতার যে অনুরাগ ছিল, এখন, তাহা কোটি গুণ বাড়িল। আনন্দে দুঃখে, হর্ষে বিষাদে, সীতাও মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছাপগমে, পতিপ্রাণা সতী বলিলেন "উত্থাণিদং পইচ্চ্যাঅ লজ্জা সল্লং মে অজ্জ উত্তেণ"। এ রকম কত দেখাইব? এই

প্রকারে, লাইনে লাইনে ভবভূতি কালিদাসের কাছে ঋণী। কিন্তু এ ঋণে বাহাদুরী এই যে, কালিদাসের চেয়ে ভবভূতির ছবি খুলিয়াছে ভাল। তুলনা করিয়া পড়িলে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

আপনারা এ দিকে আবার দেখুন, ভবভূতি কালিদাসের আর একটী বীজ লইয়া, কেমন সুন্দর পত্র-পল্লব-স্নিগ্ধ, ফল-পুষ্প-শোভিত, দেব তরু নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সর্ব্বদমন ও লবকুশ।—ঐ স্বর্গে ভগবান্ মারীচের আশ্রমে রাজা দুষ্মন্ত, পরিচারিকা-দ্বয়-বেষ্টিত, দুরন্ত-সিংহ-শিশুর জটাকর্ষণে ব্যস্ত, মুগ্ধ-মূর্ত্তি বালককে দেখিয়া ভাবিতেছেন—"এ কা'র ছেলে? কার' কুলের অবতংশ? একে দেখে আমার মন এমন করে কেন?"

আজ নিজের ছেলেকে পুরুবংশের রাজা দুষ্মন্ত নিজে চিনিতে পারিতেছেন না। রেলে ডেলিপ্যাসেঞ্জার, সুতরাং দিনের বেলায় অদৃশ্য পিতাকে, নিশীথে, ঘুমন্ত শিশু জাগিয়া যেমন চিনিতে পারে না, "বাবা" বলিয়া 'রেকগ্নাইজ'ই

করে না, সেইরূপ দুষ্মন্তকেও আজ, তাঁহার শিশুপুত্র 'পিতা' বলিয়া আমলে আনিতেছে না। কি সুন্দর চিত্র! কি মনোমোহন অঙ্কন! ভবভূতি অগ্রসর হইয়া এ ভাবটুকু কুড়াইয়া লইলেন। এই ভাবের 'ফ্রেমে' এর চেয়েও সুন্দর জম্‌কালো ছবি আঁটিয়া দিলেন।

সর্ব্বদমনত তিন চারিবছরের শিশু, দুধের ছেলে, ইহার চেনা না চেনায়, বা 'রেকগনাইজ' করা না করায়, 'সত্যি ঘরের' বাবার তত একটা কিছু আসে যায় না; কিন্তু যে ছেলের বাণের আঘাতে, চন্দ্রকেতু ও তদীয় সেনাগণ "চিত্রার্পিতারম্ভ" অজ্ঞান, যে ছেলের বীরদর্পে ক্ষত্রিয় নরপতির গৌরব-কেতন অশ্বমেধ পণ্ডপ্রায়, 'কিমক্ষত্রিয়া পৃথ্বী' 'কিং ব্যবস্থিত-বিষয়াঃ ক্ষত্রধর্ম্মাঃ' বলিয়া সিংহের ন্যায় যে ছেলে অশ্বমেধের অশ্ববন্ধন করিয়াছে, সেই ছেলেকে, পিতা রাম চিনিতে পারিতেছেন না. বলিতেছেন 'এ কে? কা'র ছেলে? একি—'ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ'? না—'সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানাং'—অথবা একি—'ক্ষাত্রোধর্ম্মঃ শ্রিত ইব

তনুং ব্রহ্মকোষস্য গুপ্ত্যৈ' ? না—'আবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎ-পুণ্য-নির্ম্মাণ-রাশিঃ' ! একে দেখে আমার অবিরাম দুঃখেরও আজ একটু বিরাম হইতেছে ! কেন এমন হয় ? কোনই ত কারণ দেখি না ?' 'অথবা—

'ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতুঃ
ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ হিম-রশ্মাবুদ্‌গতে চন্দ্রকান্তঃ ।'

আহা ! এর দিকে চাহিলেও আনন্দ !' এই ভাবে একা একা 'বিড় বিড়' করিয়া রাম কত কি বলিতেছেন।

যে দিন হইতে তাঁহার জীবনের শান্তি-প্রতিমা সংসারের লক্ষ্মী, সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই দিন—সেই অশুভ মুহূর্ত্ত হইতেই ত রামের সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়াছে ! তাই আজ অনেক দিন—অনেক বৎসর পরে, ক্ষণকালের জন্য একটু অপরিচিত, বহুকাল বিস্মৃত—সুখ পাইয়াই, রাম কত কি ভাবিতেছেন ! বলিতেছেন 'এর উপর

আমার এত স্নেহ কেন?’ যখন লব চন্দ্রকেতুর মুখে ‘প্রিয় বয়স্য! নন্থু তাতপাদাঃ!’ বলিয়া রামের পরিচয় শুনিল, শুনিয়াই অমনি, ‘চত্বারঃ খলু ভবতামেবংব্যপদেশভাগিনস্তত্রভবন্তো রামায়ণকথাপুরুষাঃ, তৎ বিশেষং ব্রূহি” বলিয়া ‘ইনি তোমার চারিজন তাতগণের কোন্‌জন’ জিজ্ঞাসা করিল, চন্দ্রকেতু বলিলেন, ‘জ্যেষ্ঠতাত’, অমনি লব উল্লাসের সহিত ‘কথং রঘুনাথঃ? দিষ্ট্যা সুপ্রভাতমস্থ, যদয়ং দৃষ্টো দেবঃ’ বলিয়া ভক্তিনম্র উদাসীনের মত বিনয় বিস্ময় এবং কৌতুকের সহিত রামের দিকে তাকাইয়া রহিল; বাল্মীকির আশ্রমে, রামায়ণে, যে রামের অশেষ কীর্ত্তিবিবরণ এত দিন পড়িয়া আসিয়াছে, এই সেই রাম, এই রামায়ণের নায়ক রাম,—ভাবিয়া কৌতুকের সহিত, পরম আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল, অনেক ক্ষণ এক-দৃষ্টে—অনিমেষলোচনে দেখিয়া শেষে প্রণাম করিল; তখন অমনি স্নেহের নির্ঝর রাম ‘অত কেন? এস এস’ বলিয়া লবকে কোলে টানিয়া লইলেন। পরিচয় অপরিচয়, সম্বন্ধ অসম্বন্ধ—সব ভুলিয়া বলিলেন ‘বৎস!

অনেক বার গাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন কর ত!' রাম জানেন না কা'কে কোলে তুলিলেন, লব ও জানেন না যে, কা'র কোলে উঠিলেন!! এমন সময়ে দূর হইতে—যেন কা'র কণ্ঠস্বর রামের কাণে গেল। না না—"কাণের ভিতর দিয়া' যেন 'মরমে পশিল'। রাম চমকিয়া উঠিলেন! সেই অবিজ্ঞাত অশ্রুত পূর্ব্বস্বরে রামের দেহ 'নবনীল-নীরধর-ধীর-গর্জ্জিত-ক্ষণবদ্ধ-কুট্মল-কদম্বতরুর' ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ক্রমে সেই—নিশীথ সময়ে বহুদূরাগত বীণাধ্বনির ন্যায়—স্বরে রামের মন-প্রাণ-দেহ—সব যেন ভরিয়া গেল, রাম এক মহান্ আনন্দ-বিভ্রমে পড়িয়া গেলেন। যাহার স্বরে রাম—উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, ক্রমে সে নিকটে আসিল। লবকে কোলে করিয়া রাম একবার আস্বাদ পাইয়াছেন, সুতরাং এবার লোভ সংবরণ করা দায়,—তিনি কুশ-কেও কোলে লইলেন। পূর্ব্বে লবকে কোলে লওয়ায় যে আশার সুখতারা মিটি-মিটি জ্বলিতে-ছিল, কুশকে পাইয়া, তাহা সহসা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু হায়, অমনি আবার হৃদয়ে নিরাশার কালো

মেঘ দেখা দিল, সব ঢাকিয়া গেল? মন আঁধারে ভরিয়া গেল—!!

আবার পরক্ষণেই রাম আনন্দে, অধীরতায়, সংশয়ে, নির্ণয়ে যেন কেমনধারা হইয়া পড়িলেন। মনে আসিতে লাগিল—'কিমপত্যময়ং দারকঃ?
অঙ্গাদঙ্গাৎ স্রুত ইব নিজোদেহজঃ স্নেহসারঃ।
প্রাদুর্ভূয় স্থিত ইব বহিশ্চেতনাধাতুরেব।
সান্দ্রানন্দক্ষুভিত-হৃদয়-প্রস্রবেণেব সৃষ্টো
গাত্রং শ্লেষে যদমৃতরসস্রোতসা সিঞ্চতীব" ॥

ইত্যাদি নানা ভাবনার পর সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন 'অয়ে ন কেবলমস্মৎ-সংবাদিনী আকৃতিঃ!

'অপি জনকসুতায়াস্তচ্চ তচ্চানুরূপ্যং
স্ফুটমিহশিশুযুগ্মে নৈপুণোন্নেয়মস্তি।
নমু পুনরিব তম্মে গোচরীভূতমক্ষো-
রভিনবশতপত্রশ্রীমদাস্যং প্রিয়ায়াঃ ॥'

ভাবিতে লাগিলেন—

"সৈবোষ্ঠমুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ"—এইভাবে ক্রমে কত কথা মনে আসিতে লাগিল! সংশয় ক্রমেই

বাড়িতে লাগিল। এ রকম ক্ষেত্রে—মানুষের মনে যাহা যাহা হয়—সব রামের মনে উদিত হইল। "তদেতৎপ্রাচেতসাধ্যুষিতমরণ্যং, যত্র কিল দেবী পরিত্যক্তা, ইরঞ্চানয়োরাকৃতির্বৎসয়োঃ"—ইত্যাদি কত কি ভাবের উদয় হইতে লাগিল!

ক্রমে অসময়ের সাথী চোখের জল দেখা দিল। কচি ছেলে লব, তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাত! একি?" অমনি কুশ 'আগ' বাড়াইয়া বলিলেন, 'সে কি লব? উনি কাঁদিবেন না?'

'বিনা সীতাদেব্যা কিমিব হি ন দুঃখং রঘুপতেঃ?
প্রিয়ানাশে কৃৎস্নং জগদিদমরণ্যং হি ভবতি;
স চ স্নেহস্তাবানয়মপি বিয়োগো নিরবধিঃ
কিমিত্যেবং পৃচ্ছস্যনধিগতরামায়ণ ইব?'

কুশের এই তটস্থিত আলাপে রামের সব আশা ভরসা ফুরাইল! মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'আর কেন? আর প্রশ্নের দরকার নাই! দগ্ধ হৃদয়, কেন তোমার হঠাৎ এ দামোদরের বাণ!' বলিয়াই রাম মন ফিরাইতে যত্ন করিলেন।

কিন্তু তা কি আর ফিরে ? ক্রমে কত কথা হইল, 'রামায়ণ কতদূর হৈয়াছে ? কতদূর পড়িয়াছ ? দু' একটা শ্লোক বল না ?'—ইত্যাদি বার্ত্তালাপে পুনরায় রাম অধীর হইয়া পড়িলেন। রামের সেই সীতাময় জীবনের সব কথাগুলি কবি, লবকুশকে দিয়া একটী একটী করিয়া মনে করাইয়া দিলেন ! এই ভাবে কত কাণ্ডের পর—কত কান্না কাটির পর—অভিনয়দর্শনের ছলে পুত্রবতী সীতার সহিত রামের পুনর্মিলন হইল। 'সজঙ্গম-স্থাবর-জগৎ' সে মিলনের সময়ে 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের' ন্যায় স্থির হইয়া—বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া সে মিলন দেখিল। অনুমোদন করিল। রামসীতার পুনর্মিলন হইল। জগৎ আনন্দে বিভোর হইল, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল !!!

শকুন্তলা ও সীতা।—দুষ্মন্ত, মৃগয়া করিতে যাইয়া, গোপনে, একা একা শকুন্তলার সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, হরিণ-বধে অকৃত-কার্য্য হইয়া নিজেই শেষে নির্জ্জনে, বাণের আঘাতে জরজর হইয়াছিলেন, সুতরাং বিরহটাও তাঁহাকে একা একা ভুগিতে হইল। আর

কেহ তাঁহার সাথে ভোগে নাই। আবার পরে পুনর্মিলনটাও তিনি একা একা ভোগ করিলেন। শকুন্তলার যাওয়া বা আসায়, থাকা বা না থাকায় প্রণয়ে বা বিরহে রাজ্যের আর কারও কিছু হয় নাই। কিন্তু সীতা ত আর শকুন্তলা নন বা রামও দুষ্মন্ত নন। সীতা সেই ধনুকভাঙ্গা পণে লব্ধ 'সীতা', সীতা—মিথিলাপতি রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিক দুহিতা। সীতা যেমন রামের হৃদয়ের অধিদেবতা ছিলেন, তেমনি জগতেরও আরাধ্য দেবতা ছিলেন। সীতার সম্পর্কে শুধু রামের সংসার নহে, সারা ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র ও আনন্দিত ছিল। সীতার বিরহেও, শুধু রামের সংসার নহে, শুধু অযোধ্যা বা মিথিলার রাজ সংসার নহে, সারা ভারতে দুঃখের ঝড়—শোকের ঝড় বহিয়াছিল, তাই আজ মিলনের দিনেও 'সব্রহ্মক্ষত্রপৌরজানপদপ্রজা', 'সদেবাসুরতির্য্যগুরগনায়কনিকায়' প্রভৃতি কি স্থাবর কি জঙ্গম—সমস্ত 'ভূতগ্রাম' উপস্থিত।

সীতার বিয়োগে যাঁহারা যাঁহারা অতল-শোক সাগরে ডুবিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সকলেই

আবার স্বপ্নাতীত, অচিন্তনীয় সুখভোগ করিবেন, তাঁহাদের নারী-কুল-দেবতা সীতা আজ ফিরিয়া আসিবেন। তাই সব এক জায়গায় সমবেত। কোথায় দুষ্মন্তের শকুন্তলার সহিত মিলন! আর কোথায় রামের সীতার সহিত মিলন! আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অপ্সার মেয়ের ('লভ্চাইল্ডের) প্রণয় বিরহ ও মিলন সম্মুখে রাখিয়া, হিন্দুর উপাস্য দেবতা রামসীতার প্রণয় বিরহ ও মিলনে ভব-ভূতি কি বাহাদুরীই দেখাইয়াছেন! রামের মত পিতাকেও লবকুশ চিনিতে পারিলেন না বা লব-কুশের মত পুত্ররত্নকে রাম চিনিতে পারিলেন না— নিরপরাধা সীতার নির্ব্বাসনের, বোধ হয়, এর চেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত, রামের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। হিন্দুর চরম প্রায়শ্চিত্ত চতু-র্ব্বিংশতি বার্ষিক প্রাজাপত্য প্রভৃতি এর কাছে কোন্ ছার!!

দুষ্মন্তকে সর্ব্বদমনের না চেনা, আর রামকে বীরবর লবকুশের না চেনা—এতদুভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! ভবভূতি কেমন করিয়া কালি-দাসের পাকা ঘরের 'পঙ্খ' করা দেওয়ালে ছবি

আঁকিয়া বাহাদুরী লইলেন! কালিদাসের সুগঠিত প্রতিমার চালচিত্র করিয়া, রঙ্গ ফলাইয়া, প্রতিমার চক্ষুদান দিয়া—আসর মাৎ করিয়া দিলেন !!

কালিদাসের উপর এ বাহাদুরী ভবভূতিরই সাজে, একমাত্র তিনিই পারেন! তাই কালিদাসের নামের সাথে তাঁহার নামও গাঁথা হইয়া গিয়াছে, 'এ বলে' আমায় দেখ্, ও বলে' আমায় দেখ্'—হইয়াছে !!

ক্রমে প্রবন্ধ বিস্তৃত সুতরাং বিরক্তিকর হইয়াছে। আর বাড়াবাড়ি করিব না; তবে বাকী রহিল ঢের, এক আনাও বলা হইল না। আশা করি—ছাত্রগণ বা অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ একবার এ বিষয়টীতে দৃষ্টিপাত করিবেন।

উপসংহার, তুলনা।—এতক্ষণে আমি আমার অদ্যকার প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কালিদাস ও ভবভূতি—উভয়কে এখন এক করিয়া দুই একটী কথা বলিলেই, আজকার মতন, সম্পাদক মহাশয়ের হুকুম তামিল করা হয়।

প্রিয় বন্ধুগণ, কালিদাস ও ভবভূতি সম্বন্ধে, যে কয়েকটী কথায়, আমাকে মোহিত করিয়াছে,

আমার এই সমস্ত প্রবন্ধটী যে ক'টী কথার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা স্বরূপ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গভীর-চিন্তা-পূর্ণ সেই কথা কয়েকটীর মর্ম্ম আমি আপনাদিগকে এখন সঙ্ক্ষেপে শুনাইব—

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত কাব্যে সুপরি-চিত। সংস্কৃত ভাষার চিরপ্রকাশ ভাস্কর। ইহাঁরা দুই জনেই সুকবি, সুপণ্ডিত, সুরসিক। দু'জনেই ভাবুক-কুলচূড়ামণি। বাণীর বরপুত্র। কবিতা রাজ্যের রাজরাজেশ্বর। ভগবান তাঁহাদিগকে প্রতিভা দিয়াছিলেন, এবং লোকে তাঁহাদের কবিতায় মুগ্ধ হইয়া বাহবা দিয়াছিল, বরাবর দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, তত দিন দিবেও।

এই দুইজনের কেহই সকল লোক বিমোহিত করিবার জন্য কাব্য লিখেন নাই। কেবল শিক্ষিত সামাজিকদিগের জন্য, কবিতারসামোদীদিগের জন্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সকল লোকমোহনের জন্য রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণসমূহ রচিত পঠিত কীর্ত্তিত ও গীত হইয়া-

ছিল। কিন্তু সামাজিক লোকের তাহাতে ষোল আনা মন উঠিত না। কেন না সে সকল বড় লম্বা। অনেক জায়গায় মাত্রা কিছু বেশী। কোথাও কল্পনার দৌড় খুব বেশী—খুব জাঁকালো কিন্তু তা'র পরক্ষণেই 'লেংচায়'—কল্পনায় টান ধরে। কোথাও বেশ ভাল কথা কিন্তু তা'র পরই আর এক রকম। কোথাও খুটাইয়া খুটাইয়া একটা জিনিষের বর্ণনায় 'দিক' করিয়া তুলিয়াছে। আবার কোথাও হয়ত, যে সকল কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই হইল না। বাস্তবিক ঐ সকল পুরাতন কাব্যে কবিত্ব আছে, রচনা আছে, উপদেশ আছে, আনন্দ আছে, সৌন্দর্য্য আছে—অথবা এক কথায় বলিতে গেলে সব আছে—কিন্তু নাই কেবল একটী জিনিষ,—ছাঁটা নাই। শিল্প আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র সে শিল্পোচিত চমৎকারিত্ব নাই। আশানুরূপ 'কারিগরি' নাই। পরিমাণের জ্ঞান যেন একটু কম। তাই তখনকার শিক্ষিত লোকে—সামাজিক সমজ্‌দার লোকে, ঐ সমুদয় কাব্য অপেক্ষা ভাল জিনিষ চাহিতেন। উহাতে তাঁহাদের মন উঠিত না।

আশা পূরিত না। ঋষি রচনার পরে—এইরূপে ক্রমে অন্যরকম রচনার প্রয়োজনীয়তা সমাজে অনুভূত হইতে লাগিল। সে রচনায় ঋষি রচনার সবগুণ থাকিবে। তার উপর, বেশ ছাটাছোটা 'কারিগরী' থাকিবে। ছোট হইবে। অল্পে পড়া যাইবে। অল্পে শুনা যাইবে। আর সকলের উপর চাই যে, একঘেয়ে হইবে না।

ক্রমে পরে—আরও পরে—এমন সময় আসিল, যখন পড়া বা শুনার সময় নাই, অথবা শুনিয়া শুনিয়া—সেই—কল্পনার অমৃতহ্রদে—সেই ভাবের সমুদ্রে, ডুবিবার বা ডুবিয়া রসগ্রহ করিবার অবসর নাই। তাই তখন দেখা আবশ্যক হইল, দেখিয়া বুঝা আবশ্যক হইল। এইরূপে ক্রমে—দৃশ্য কাব্যের—নাটকের সৃষ্টি হইল। এই শ্রেণির কবিগণের মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতিই অগ্রগণ্য। দুইজনেরই মালমসল্লা এক, রঙ্গ এক, ধরণও এক—কেবল ঢঙ্ আলাদা। এক জন কেবল সৌন্দর্য্য মাত্র দেখেন—আর কিছুই দেখেন না। পাছে 'বেশী হইয়া পড়ে' বলিয়া অতি গভীর ভাবও অল্পে অল্পে প্রকাশ করেন। বড় বড় ঘটনাও

খুব সঙ্ক্ষেপ করেন। বড় বড় জিনিষ দু'কথায় বলিয়া ফেলেন। খুব বাহাদুরী! খুব নিপুণতা। গোটা হিমালয়টা ১৭ শ্লোকে, গোটা সমুদ্রটা ১৫ শ্লোকে, বসন্তটা ১৬ শ্লোকে, পত্নীবিয়োগের আর্ত্তনাদটা ১৮ শ্লোকে, পতিবিয়োগের কান্না ৩৩ শ্লোকে, রাজ বাড়ীর বরযাত্রীর ঘটাপটা ৮ শ্লোকে বর্ণনা করিয়া জমাইয়া তুলা অসাধারণ ক্ষমতার কথা। এপর্য্যন্ত তেমনটী জমাইতে আর কেহ পারেন নাই। বোধ হয় আর—পারিবেনও না। অমন ছাঁট্ আর হইবে না! অমন 'ওজন জ্ঞান' আর হইবে না! এ সবই সত্য! কিন্তু একটী কথা আছে।

মানুষের মন যখন মাতিয়া উঠে, প্রেমে হউক, শোকে হউক, স্নেহে হউক—মানুষ যখন 'পাগল পারা' হয়, তখন অতটা ছাঁট্‌লে ছুট্‌লে, অত 'ছোব' 'ছোব' করিলে সকলের ততটা পছন্দ সই হয় না। কেমন যেন 'রুটিন' ধরিয়া কান্নার মতন হয়। ও সবস্থলে একটু আধটু মাত্রা বেশীতে দোষ হয় না। প্রত্যুত সৌন্দর্য্যের বিকাশ আরও অধিকতর হয়। তাই ভাবুকপ্রবর ভবভূতি ঐ

প্রকার স্থলে, প্রয়োজন মতে, একটু আধটু মাত্রা বেশী করিয়াছেন। তাই তাঁহার বাঁশরীর ঝঙ্কারে লোকের মন মাতিয়াছে বেশী। কালিদাস নিজে থাকিলে হয়ত বলিতেন "ভায়া হে! মাত্রা চড়াইলে?" কিন্তু ভবভূতি ভাবিলেন, যে, 'ইহাতে সৌন্দর্য্যের হানি না হইয়া বরং বাড়িয়াই যাইবে।' তাই ঐ সকল স্থলে তিনি হাতটা একটু 'দরাজ' করিয়া দিলেন।

ভবভূতি ও কালিদাসে আর একটু তফাৎ আছে—সেটুকু এই—কালিদাস যখন কবি, তখন ভারতবর্ষ এক রাজার অধীন, এক ছত্রের তলে—শান্তির অঞ্চলে সুপ্ত। তখন সমগ্র ভারতের সকল বিষয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা এক জন রাজা। তাই কালিদাসের কবিতার বিষয় ভারতব্যাপী। রঘুর-দিগ্‌বিজয়, ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভা তা'র অন্যতম প্রমাণ। তাঁহার সময়ে লেখা পড়ার চর্চ্চা খুব বেশী। ভারতের সর্ব্বত্রই লেখা পড়ার একটানা খর স্রোত প্রবাহিত। তখন ভারতে সুরসিক, সুপণ্ডিত সামাজিক অনেক। তখন বিদ্যার গৌরবে, শিল্পের গৌরবে, কলার গৌরবে—ভারত জগ-

তের শীর্ষস্থানীয়। ওরকম সময়ে--ভারতের ও প্রকার জাঁকের দিনে, কোন রকম 'বিদ্যাপ্রকাশ' করিলেই যে তাহা ধরা পড়িবে, এতত্ত্বটা কবিকুল রবি কালিদাস বেশ তলাইয়া বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই কোনও স্থানে তিনি, অযথা 'বিদ্যাপ্রকাশ' করিতে যান নাই। কোথাও 'আগড়ম বাগ্‌ড়ম' বকেন নাই। সর্ব্বত্রই হাত টান রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের সময়ে হিন্দুদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, তাই তখনকার কল্পনাও সর্ব্বব্যাপিনী—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—ওজস্বিনী।

ভবভূতির সময়ে ভারত-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভারতের সে চরম উন্নতির তপন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। আগে--উন্নতির দিনে—যে শিক্ষা দীক্ষা কল্পনা--গোটা ভারতবর্ষে এক ভাবে ছিল, এখন সেই সমগ্রভারত-ব্যাপিনী বিদ্যা-- সমগ্রভারতব্যাপিনী কল্পনা, ছোট ছোট ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাজ্যে ছোট্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাই কালিদাসের ন্যায় ভবভূতির প্রতিভায়--সমগ্রভারতের 'ফটো' উঠে নাই। কালিদাসের প্রতিভার বিকাশস্থল ছিল সমগ্রভারত, আর ভবভূতির

প্রতিভা মাত্র বিদর্ভের মধ্যেই আবদ্ধ,তাহার বাহিরে যায় নাই। তখন সামাজিক দিগের অভিমান বিলক্ষণ আছে, কিন্তু অভিমানোচিত পদার্থ নাই। সেই কত পূর্ব্বের অভিমানে বর্ত্তমান নবদ্বীপের-- ন্যায়, তথনকার সামাজিকদিগের মনে একটা বিষম দেমাক ছিল,—কিন্তু হৃদয়ের প্রকৃত বিকাশ ছিল না। তথনকার তাঁহারা কতকটা গতানু-গতিকে পড়িয়া গিয়াছেন। তাই কালিদাসের ন্যায় ভবভূতির ভাগ্যে ভাল সমজদার (Expert) সামাজিক জোঠে নাই। তাই ভবভূতি কালি-দাসের পদানুসরণ করিয়াছেন। ভবভূতি বুঝিয়া-ছিলেন যে,—"আমি অসময়ে আসিয়াছি, এটা পূর্ণ বিকাশের সময় নহে।" তাই তিনি 'মহাবীর চরিত' লিখিয়া, বিষম 'ধাকা' খাইয়া 'মালতীমাধ-বের' সময়ে, গভীর ক্ষোভে, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলের ব্রণের বেদনায় বলিয়াছিলেন—

> "যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
> জানন্তি তে কিমপি, তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
> উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
> কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

এটা তাঁহার অহঙ্কার বা স্পর্দ্ধার কথা নহে, এটা তাঁহার গভীর দুঃখের কথা! 'আমি নিজে যে অমৃতে—যে অপার্থিবরসে—আত্মহারা হইয়াছি, তাহা, যাহাদিগকে ভাল বাসি, আমার সেই স্বদেশ-বাসী প্রিয় সামাজিকদিগকে আস্বাদন করাইতে গেলাম, আর তা'রা কি না মুখ বাঁকাইয়া লইল'—ইহাতে দুঃখ না হয় কা'র? ব্যথা না পায় কে? তাই ভবভূতি ব্যথা পাইয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন। গভীর আত্মবেদনায় ঐ কথা বলিয়াছিলেন। স্পর্দ্ধা করেন নাই।

বুঝিবার শক্তি-রহিত, অথচ অভিমানী সামাজিকগণের মন আকর্ষণ করিবার জন্য, "যদ্বেদাধ্যয়ন" বলিয়া, তাঁহাকে খবরের কাগজের উপহারের ন্যায়,—উপহারেরও বিজ্ঞাপন দিতে হইয়াছিল। তাঁহার "অস্থানে পততামতীব মহতা-মেতাদৃশী দুর্গতিঃ"র চরম—হইয়াছিল!

তাঁহার কাব্যে নূতন ব্যাপার, নূতন জিনিষ, নূতন নূতন ভাব খুব বেশী না হইলেও, তাঁহার কল্পনার গঠনপ্রণালী দেখিলে, তাঁহার উদার রমণীয় ভাববিন্যাসের সুকৌশল দেখিলে, তাঁহাকে

অলৌকিক-শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কাব্য যখনই হাতে লই—তখনই আত্মহারা হই, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে, তাঁহার উদ্দেশে, মস্তক আপনিই নত হইয়া আইসে। তাঁহার রাম, তাঁহার সীতা, তাঁহার বাসন্তী, তাঁহার তমসা—সকলই দিব্য সকলই অনুপম। ঐ সকল চিত্রে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কাব্য—

"দেখিলে জুড়ায় আঁখি,
ভাবিলে অন্তর সুখী,
নিখিল জগৎ করে সুখময় ধাম,
সুধাধারা ঢালে কাণে,
প্রাণে প্রাণ দিয়া টানে
কি যেন মোহিনী-মাখা"—অনুপম ঠাম!!!

সম্পূর্ণ